ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম-৫ (হজ)

[Bengali - বাংলা - بنغالي]

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন

৯০৩

অনুবাদ:আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ শাহেদ আল-কাফী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

فتاوى أركان الإسلام

[الحج]

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة:
عبد الله بن شاهد المدني
محمد عبد الله الكافي
مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

সূচীপত্র

৭০	কঙ্কর যদি হাওয বা গর্তের মধ্যে না পড়ে	
৭১	সাতটি কঙ্করের মধ্যে দু'একটি কঙ্কর হাওযে না পড়লে ...	
৭২	যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা কি পুনরায় নিক্ষেপ করা যাবে?	
৭৩	তাওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে হজের সা'ঈ করা কি জায়েয?	
৭৪	কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলে আদায় হবে? ...	
৭৫	বিশেষ করে ঈদের দিনের তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করা কি জায়েয?	
৭৬	তাওয়াফের পর কি সরাসরি সা'ঈ করতে হবে? নাকি বিলম্ব করা যাবে?	
৭৭	ওমরায় যে ব্যক্তি মাথার এদিক ওদিক থেকে অল্প করে চুল কাটে	
৭৮	কঙ্কর মারার সময় কী?	
৭৯	জনৈক হাজী আরাফাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মীনায় রাত কাটায়নি, কঙ্কর নিক্ষেপ করে নি এবং তাওয়াফে ইফাদ্বাও করে নি...	
৮০	মুযদালিফার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাইরে অবস্থান করলে করণীয় কী?	
৮১	ইফরাদ হজকারী যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ করে নেয়	
৮২	কিরানকারীর জন্য একটি তাওয়াফ ও একটি সা'ঈ যথেষ্ট হবে?	
৮৩	জনৈক ব্যক্তি রাত বারোটা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা চলে গেছে, ...	
৮৪	১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করার পর কাজ থাকার ...	
৮৫	১৩ জিলহজ সকালে কঙ্কর মারা জায়েয আছে কি?	
৮৬	১২ তারিখে কঙ্কর না মারলে এবং বিদায়ী তাওয়াফ না করলে ...	
৮৭	রাতের বেলায় মিনায় স্থান না পেলে মানুষ কী করবে?	
৮৮	বিদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার বিধান?	
৮৯	উমরাকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করার বিধান কী?	
৯০	ইহরাম বাঁধার পর হজ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে করণীয় কী?	
৯১	হজের ইচ্ছা করার পর যদি তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, তবে ...	
৯২	হজ করতে এসে পাপের কাজে লিপ্ত হলে কি হজের ছাওয়াব কমে যাবে?	
৯৩	জাল পাসপোর্ট বানিয়ে হজ করলে হজ হবে কী?	

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُ﴾ [ال عمران: ١٩]

“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনিত দীন হচ্ছে ইসলাম।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯]

তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অনুসন্ধান করবে, ওটা তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “দীন ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। ১) এ কথার স্বাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা।

৩) যাকাত প্রদান করা।

৪) মাহে রামাযানে সিয়াম পালন করা এবং

৫) সাধ্য থাকলে আল্লাহর ঘরের হজ পালন করা।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই, জিজ্ঞাসার শেষ নেই। তাই নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলেমে দীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শাইখ **মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ.** ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জবাব প্রদান করেছেন। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশুদ্ধ হাদীস ও পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য উলামাদের মতামত থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নাসের ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান’। নাম দিয়েছেন **‘ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম’**। ইসলামী জ্ঞানের জগতে বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায় বাংলা ভাষায় আমরা তা অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করি। তাছাড়া বাংলা ভাষী মুসলিমদের জন্য এধরণের দলীল নির্ভর পুস্তকের খুবই অভাব। তাই বইটিকে সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি জুবাইল দা‘ওয়া সেন্টারের দা‘ওয়া বিভাগের পরিচালক শাইখ খালেদ নাসের আল-উমাইরির। তিনি বইটি প্রকাশ করার ব্যাপারে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সুবিজ্ঞ পাঠক সমাজের প্রতি বিশেষ নিবেদন, কোনো প্রকার ভুল-ত্রুটি নজরে আসলে আমাদেরকে জানিয়ে বাধিত করবেন। যাতে করে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা যায়। হে আল্লাহ এ বইয়ের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও ছাপানোর কাজে সহযোগিতাকারী, তত্ত্বাবধানকারী এবং পাঠক-পাঠিকাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান কর। সকলকে মার্জনা কর এবং এ কাজটিকে তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবূল কর।

আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী
মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-কাফী

كتاب الحج

কিতাবুল হজ্জ

প্রশ্ন: (৪৪৯) বে-নামাযীর হজের বিধান কী? যদি এ ব্যক্তি তাওবা করে, তবে সমস্ত ইবাদত কি কাযা আদায় করতে হবে?

উত্তর: সালাত পরিত্যাগ করা কুফুরী। সালাত ছেড়ে দিলে মানুষ ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে এবং চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। একথার দলীল হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ্ ও সাহাবায়ে কেরামের উক্তি। অতএব, যে লোক সালাত পড়ে না তার জন্য মক্কা শরীফে প্রবেশ করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَا﴾ [التوبة: ٢٨]

“হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব, তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ২৮]

যে ব্যক্তি সালাত পড়ে না, তার হজ বিশুদ্ধ হবে না এবং কবূলও হবে না। কেননা কাফিরের কোনো ইবাদতই সঠিক নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا مَنَعَهُمۡ أَن تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقَٰتُهُمۡ إِلَّآ أَنَّهُمۡ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأۡتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمۡ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَٰرِهُونَ ٥٤﴾ [التوبة: ٥٤]

“আর তাদের দান-খায়রাত গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে এজন্যে যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফুরী করেছে, তারা শৈথিল্যের সাথে ছাড়া সালাত আদায় করে না। আর তারা দান করে না, কিন্তু অনিচ্ছার সাথে করে।” [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ৫৪]

তবে যে সমস্ত আমল তারা পূর্বে পরিত্যাগ করেছে তা কাযা আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ﴾ [الانفال: ٣٨]

“(হে নবী!) আপনি কাফিরদেরকে বলে দিন, তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে (এবং আল্লাহর দীনে ফিরে আসে) তবে পূর্বে যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি এরূপ অন্যায় করেছে সে যেন আল্লাহর কাছে খাঁটিভাবে তাওবা করে। নেক কাজ চালিয়ে যায়। বেশি বেশি তাওবা ইস্তেগফার ও অধিকহারে ভালো কাজ করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে। আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٥٣﴾ [الزمر: ٥٣]

“বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুণাহ্ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩]

যারা তাওবা করতে চায় আল্লাহ তাদের জন্য এ আয়াতগুলো নাযিল করেছেন। সুতরাং বান্দা যে পাপই করে না কেন- যদি শির্কও হয় এবং আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহই সরল সঠিক পথে হিদায়াতদানকারী।

হজ ফরয হয়ে গেলে আদায় করতে বিলম্ব করা উচিৎ নয়

প্রশ্ন: (৪৫০) ব্যাপকভাবে দেখা যায় অনেক মুসলিম বিশেষ করে অনেক যুবক ফরয হজ আদায় করার ব্যাপারে শীথিলতা প্রদর্শন করে। এবছর নয় ঐ বছর এভাবে বিলম্ব করে। কখনো কর্ম ব্যস্ততার ওযর পেশ করে। এদেরকে আপনার নছীহত কী?

কখনো দেখা যায় কোনো কোনো পিতা যুবক ছেলেদেরকে ফরয হজ আদায় করতে বাধা দেয় এ যুক্তিতে যে, এখনো তাদের বয়স হয় নি, হজের ক্লান্তি সহ্য করতে পারবে না। অথচ হজের পূর্ণ শর্ত তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। পিতার এ কাজের বিধান কী? এধরণের পিতার আনুগত্য করার বিধান কী?

উত্তর: একথা সর্বজন বিদিত যে, হজ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন এবং বিরাট একটি ভিত্তি। হজের শর্ত পাওয়া গেলে হজ আদায় না করলে মানুষের ইসলাম পূর্ণ হয় না। হজ ফরয হওয়ার পর বিলম্ব করা বৈধ নয়। কেননা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ তাৎক্ষণিক আদায় করতে হবে। মানুষ জানে না ভবিষ্যতে তার জন্য কি অপেক্ষা করছে। হতে পারে অর্থ শেষ হয়ে যাবে বা অসুস্থ হয়ে যাবে বা মারা যেতে পারে।

হজ আদায় করার শর্ত পূর্ণ হলে এবং হজের সফরে ধর্মীয় ও চারিত্রিক দিক থেকে নির্ভরযোগ্য সাথী থাকলে, সন্তানদেরকে হজ আদায় করতে বাধা দেওয়া পিতা-মাতার জন্য জায়েয নয়।

হজ ওয়াজিব হলে, হজ ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার নির্দেশ মান্য করা চলবে না। কেননা আল্লাহর নাফরমানী করে সৃষ্টিকুলের আনুগত্য করা যাবে না। তবে বাবা-মা যদি তাদেরকে নিষেধের ব্যাপারে কোনো শর‘ঈ কারণ উপস্থাপন করে, তখন তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: (৪৫১) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কি হজ করা আবশ্যক?

উত্তর: মানুষের উপর যদি এমন ঋণ থাকে যা পরিশোধ করার জন্য তার সমস্ত সম্পদ দরকার, তবে তার উপর হজ ফরয নয়। কেননা আল্লাহ তো শুধুমাত্র সামর্থবান মানুষের ওপর হজ ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার এ যে, যারা এ ঘর পর্যন্ত আসার সামর্থ্য রাখে তারা এর হজ পালন করবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

সুতরাং ঋণে জর্জরিত ব্যক্তি তো সামর্থবান নয়। অতএব, প্রথমে সে ঋণ পরিশোধ করবে তারপর সম্ভব হলে হজ আদায় করবে।

কিন্তু ঋণ যদি কম হয় এবং ঋণ পরিশোধ করে হজে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করার সমান খরচ বিদ্যমান থাকে, তবে হজ করবে। হজ চাই ফরয হোক বা নফল। কিন্তু ফরয হজ আদায় করার ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিৎ নয়। আর নফল হজ তো ইচ্ছাধীন। মন চাইলে করবে মন চাইলে করবে না, কোনো গুনাহ হবে না।

বদলী হজ

প্রশ্ন: (৪৫২) মায়ের পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করার জন্য জনৈক লোককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেল এ লোক আরো কয়েকজনের হজ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ সময় করণীয় কী? এ লোকের বিধান কী?

উত্তর: প্রত্যেক মানুষের উচিৎ হচ্ছে, যে কোনো কাজ করার পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া। ধর্মীয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য না হলে তাকে কোনো কাজের দায়িত্ব দিবে না। লোকটি বিশ্বস্ত কিনা, যে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা, তার নিকট সে ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা প্রভৃতি যাচাই বাছাই করবে।

হজ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। তাই আপনার পিতা বা মাতার পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করার জন্য এমন লোক নির্বাচন করবেন, যিনি জ্ঞান ও ধর্মীয় দিক থেকে বিশস্ত ও নির্ভরযোগ্য। কেননা অনেক মানুষ হজের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। যথাযোগ্য নিয়মে হজ আদায় করে না। যদিও তারা নিজেদের ইবাদতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। কিন্তু তারা ধারণা করে এটুকুই তাদের ওপর ওয়াজিব। অথচ তারা অনেক ভুল করে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এধরণের মানুষের কাছে হজের দায়িত্ব প্রদান করা উচিৎ নয়।

আবার অনেক লোক এমন আছে, যারা হয়তো হজের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে কিন্তু তারা আমানতদার নয়। ফলে হজের কার্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে কথা ও কাজে কোনো গুরুত্বারোপ করে না।

শুধুমাত্র দায়সারা গোছের কাজ করে। এ ধরণের লোকের কাছে হজ পালনের আমানত অর্পন করা উচিৎ নয়। সুতরাং হজের দায়িত্ব প্রদান করার জন্য দীন ও আমানতদারীতে নির্ভর করা যায় এরকম লোক অনুসন্ধান করা জরুরী।

প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি যে কয়জনের হজের দায়িত্ব নিয়েছে- হতে পারে সে অন্য লোকদের দ্বারা তাদের হজগুলো আদায় করে দিবে। কিন্তু এরূপ করাও কি তার জন্য জায়েয হবে? অর্থাৎ হজ বা উমরা আদায় করে দেওয়ার জন্য কয়েক জনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেওয়ার পর সরাসরি তা নিজে আদায় না করে অন্য লোককে দায়িত্ব দেওয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর: এটাও জায়েয বা বৈধ নয়। এটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ। কেননা এটা হজ-উমরা নিয়ে ব্যবসা করা। মানুষের হজ-উমরা আদায় করে দেওয়ার নাম করে তাদের নিকট থেকে পয়সা নেয়; অতঃপর কম মূল্যে অন্য লোককে নিয়োগ করে। এতে সে অন্যায়ভাবে কিছু সম্পদ কামাই করল। কেননা হতে পারে হজের দায়িত্ব প্রদানকারী এ তৃতীয় ব্যক্তির ওপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিৎ। মানুষের অর্থ নিজের পকেটে ঢুকানোর আগে চিন্তা করা উচিৎ এটা কি ঠিক হলো না বেঠিক?[১]

---

[1] উল্লেখ্য যে, হজ্জের দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় যদি তাকে বলে নেয় যে, আমি নিজে না পারলে আমার দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য কোন লোককে দিয়ে আপনার এই হজ পালন

ইহরাম বাঁধার পর হজ-উমরা আদায় করতে অক্ষম হলে

প্রশ্ন: (৪৫৩) অতিবৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তি উমরা করার জন্য ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছার পর উমরা আদায় করতে অপারগ হয়ে গেছে এখন সে কি করবে?

উত্তর: সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকবে, অতঃপর উমরা আদায় করবে। কিন্তু যদি ইহরাম বাঁধার সময় শর্ত করে থাকে, তবে ইহরাম খুলে ফেলবে, তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। উমরা পূর্ণ করতে হবে না বিদায়ী তাওয়াফও করতে হবে না। ইহরামের সময় শর্ত করার নিয়ম হচ্ছে, এ দো'আ পাঠ করবে: [আল্লাহুম্মা ইন হাবাসানী হাবেস ফা মাহাল্লী হাইসু হাবাসতানী] "হে আল্লাহ্! কোনো কারণে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই (হজ-উমরার কাজ সমাধা করতে না পরি), তবে যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হব, সেটাই আমার হালাল হওয়ার স্থান।"[২]

কিন্তু যদি উক্ত শর্ত না করে আর উমরা আদায় কোনো ক্রমেই সম্ভব না হয়, তবে সে ইহরাম খুলে ফেলে হালাল হয়ে যাবে এবং ফিদইয়া হিসেবে একটি হাদঈ যবাই করে দিবে যদি সামর্থ থাকে। কেননা আল্লাহ বলেন,

---

করিয়ে দিব। একথায় যদি দায়িত্ব প্রদানকারী রাজি হয়, তবে অন্য লোক দ্বারা হজ করানোতে কোনো অসুবিধা নেই।- অনুবাদক।

[2] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, হাদীস নং ৪৬৯৯; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, হাদীস নং ২১০১।

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“তোমরা আল্লাহর জন্য হজ-উমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্ত হও তবে যা সহজপ্রাপ্য তাই কুরবানী কর। আর কুরবানীর পশু তার জায়গায় না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা মাথা মুণ্ডন করবে না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরী সনে উমরা পালন করতে গেলে হুদায়বিয়া নামক এলাকায় মক্কার কাফিরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে সেখানেই তিনি হাদঈ যবেহ করেন এবং হালাল হয়ে যান।

প্রশ্ন: (৪৫৪) বদলী হজ করার পর যদি কিছু অর্থ থেকে গেলে কি করবে?

উত্তর: বদলী হজ করার জন্য যদি অর্থ নিয়ে থাকে, আর হজ সম্পাদন করার পর কিছু অর্থ তার কাছে রয়ে যায়, তবে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয়। তবে অর্থ দাতা প্রদান করার সময় যদি এরূপ বলে যে, ‘এই অর্থ থেকে যা লাগে তা দিয়ে হজ করবেন।’ তবে হজ শেষে কোনো কিছু বাকী থাকলে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক। সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তা ফেরত নাও নিতে পারে, ইচ্ছা করলে ফেরত নিতে পারে। কিন্তু অর্থ দেওয়ার সময় যদি এরূপ বলে, ‘এই অর্থ দ্বারা আপনি হজ করবেন।’ তাহলে যা বাকী থাকবে তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক নয়। অবশ্য এভাবে প্রদান করার সময় প্রদানকারী যদি না জানে যে হজের

খরচ কত লাগতে পারে তাই তাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে দেয়, তখন তার পক্ষ থেকে হজ সম্পাদনকারীর একথা বলা ওয়াজিব যে, আপনার অর্থ দ্বারা আমি হজ সম্পাদন করেছি ঠিকই; কিন্তু তাতে এ পরিমাণ টাকা খরচ হয়েছে। বাকীটা আমার কাছে রয়ে গেছে। এখন সে যদি তাকে সেটা গ্রহণ করার অনুমতি দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। অন্যথা তা ফেরত দিতে হবে।

কারো পক্ষ থেকে হজ বা উমরা করলে নিজের জন্য দো‘আ করা যাবে কী?

প্রশ্ন: (৪৫৫) পুত্র যদি পিতার পক্ষ থেকে হজ বা উমরা সম্পাদন করে, তবে নিজের জন্য দো‘আ করতে পারবে কী?

উত্তর: হ্যাঁ, সে হজ বা উমরা অবস্থায় নিজের জন্য তার পিতার জন্য এবং সমস্ত মুসলিমদের জন্য দো‘আ করতে পারবে। কেননা কারো পক্ষ থেকে হজ-উমরা আদায় করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার পক্ষ থেকে নিয়ত করে বাহ্যিক ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত কর্মসমূহ আদায় করা। কিন্তু দো‘আর বিষয়টি হজ বা উমরার কোনো ফরয বা ওয়াজিব বা শর্ত নয়। তাই যার জন্য হজ বা উমরা করছে তার জন্য, নিজের জন্য, সমস্ত মুসলিমদের জন্য দো‘আ করতে পারবে।

প্রশ্ন: (৪৫৬) হজ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করার বিধান কী?

উত্তর: বদলী হজ বা উমরা করার দু’টি অবস্থা:

প্রথম অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে ফরয হজ বা উমরা আদায় করবে।

দ্বিতীয় অবস্থাঃ তার পক্ষ থেকে নফল হজ বা উমরা আদায় করবে।

ফরয হজ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। তবে কোনো বাধার কারণে যদি মক্কা পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব না হয়- যেমন, কঠিন অসুখ যা ভালো হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই

অথবা অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছে ইত্যাদি, তাহলে তার পক্ষ থেকে কাউকে দিয়ে বদলী হজ করাবে। কিন্তু অসুস্থতা যদি এমন হয় যে তা থেকে আরোগ্য পাওয়ার আশা আছে, তবে অপেক্ষা করবে এবং সুস্থ হলে নিজেই নিজের হজ-উমরা সম্পাদন করবে। কেননা কোনো বাধা না থাকলে হজ বা উমরার ব্যাপারে কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ﴾ [ال عمران: ٩٧]

“মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার এ যে, যারা এ ঘর পর্যন্ত আসার সমর্থ রাখে তারা সেটার হজ পালন করবে।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৯৭]

ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ তা নিজে বাস্তবায়ন করবে; যাতে করে আল্লাহর জন্য তার দাসত্ব-গোলামী ও বিনয়ের পূর্ণতা লাভ করে। আর নিঃসন্দেহে অন্যকে দায়িত্ব দিলে ইবাদতের এ মহান উদ্দেশ্য সঠিকভাবে আদায় হবে না।

কিন্তু সে যদি নিজের ফরয হজ ও উমরা আদায় করে থাকে, অতঃপর আবার তার পক্ষ থেকে নফল হজ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করে, তবে জায়েয হবে কি না? এক্ষেত্রে বিদ্বানগণ মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, জায়েয। কেউ বলেছেন, নাজায়েয। আমার মতে যেটা সঠিক মনে হয়, তা হচ্ছে নাজায়েয। অর্থাৎ নফল হজ আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা জায়েয নয়। কেননা

ইবাদতের মূলনীতি হচ্ছে, ব্যক্তি নিজে তা আদায় করবে। যেমন করে নিজের পক্ষ থেকে সাওম আদায় করার জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না। অবশ্য ফরয সাওম কাযা রেখে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে, তবে তার পক্ষ থেকে পরিবারের যে কেউ তা আদায় করে দিবে। অনুরূপ হচ্ছে হজ। এটি এমন একটি ইবাদত যা আদায় করার জন্য শারিরীক পরিশ্রম আবশ্যক। এটা শুধু আর্থিক ইবাদত নয়। আর ইবাদত যদি শারিরীক হয়, তবে তা অন্যকে দিয়ে আদায় করলে বিশুদ্ধ হবে না। কিন্তু হাদীসের দলীলের ভিত্তিতে যেটুকু অনুমতি পাওয়া যায় তার কথা ভিন্ন। আর বদলী নফল হজ আদায় করার ব্যাপারে হাদীসে কোনো দলীল পাওয়া যায় না। ইমাম আহমাদ থেকে এ ব্যাপারে দু'ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। তার একটি বর্ণনা আমাদের কথার সমর্থক। অর্থাৎ নফল হজ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে নিয়োগ করা যাবে না। চাই তার সামর্থ্য থাক বা না থাক।

আমাদের এ মতানুযায়ী সম্পদশালী লোককে নিজেই নিজের হজ বা উমরা আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কেননা অনেক মানুষ এমন আছে, বছরের পর বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে অথচ কখনো তারা মক্কা সফর করে নি। এ যুক্তিতে যে, সে তো প্রতি বছর তার পক্ষ থেকে হজ বা উমরা আদায় করার জন্য কাউকে না কাউকে প্রেরণ করে থাকে। অথচ তাদের জানা নেই যে, এ দ্বারা ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য আদায় হয় না।

প্রশ্ন: (৪৫৭) মৃতের পক্ষ থেকে উমরা আদায় করা কি জায়েয?

উত্তর: মৃতের পক্ষ থেকে হজ বা উমরা আদায় করা জায়েয। অনুরূপভাবে তাওয়াফ এবং যাবতীয় নেক আমল তার পক্ষ থেকে আদায় করা জায়েয। ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল রহ. বলেন, যে কোনো নৈকট্যপূর্ণ কর্ম সম্পাদন করে যদি তার ছাওয়াব জীবিত বা মৃতের জন্য দান করে দেয়, তবে সে উপকৃত হবে। কিন্তু সাওয়াব দান করার চাইতে মৃতের জন্য দো'আ করা বেশি উত্তম। দলীল হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, তিনি বলেন,

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

"মানুষ মারা গেলে তিনটি আমল ছাড়া তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। ১) সাদকায়ে জারিয়া ২) উপকারী ইসলামী বিদ্যা ৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করবে।"[৩] এ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ বলেন নি, সৎ সন্তান, যে তার জন্য ইবাদত করবে বা কুরআন পড়বে বা সালাত পড়বে বা উমরা করবে বা সাওম রাখবে ইত্যাদি। অথচ হাদীসটিতে প্রথমে দু'টি আমলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। যদি মৃতের জন্য আমল করা উদ্দেশ্য হত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলতেন, "এবং সৎ সন্তান, যে তার জন্য আমল করবে।"

[3] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: ওসীয়ত, অনুচ্ছেদ: মৃত্যুর পর মানুষের কাছে যে সাওয়াব পৌঁছে থাকে তার বর্ণনা।

কিন্তু মানুষ যদি কোনো নেক আমল করে তার ছাওয়াব কারো জন্য দান করে দেয়, তবে তা জায়েয।

মাহরাম ছাড়া নারীর হজ সম্পাদন করার বিধান

প্রশ্ন: (৪৫৮) মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যদি হজ সম্পাদন করে, তবে কি তা বিশুদ্ধ হবে? বুদ্ধিমান বালক কি মাহরাম হতে পারে? মাহরাম হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আবশ্যক?

উত্তর: তার হজ বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু মাহরাম ছাড়া সফর করা হারাম এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী। কেননা তিনি বলেন, "নারী কোনো মাহরাম ছাড়া যেন সফর না করে।"[৪]

বালেগ বা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি এমন বালক মাহরাম হতে পারে না। কেননা তার নিজেরই তো অভিভাবক ও তত্ত্বাবধান দরকার। অতএব, এধরণের মানুষ কি করে অন্যের অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়ক হতে পারে?

মাহরাম ব্যক্তির জন্য শর্ত হচ্ছে, সে মুসলিম হবে, পুরুষ হবে, প্রাপ্ত বয়স্ক হবে এবং বিবেকসম্পন্ন হবে। এগুলো শর্তের কোনো একটি না থাকলে সে মাহরাম হতে পারবে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, আফসোসের সাথে লক্ষ্য করা যায়, অনেক নারী মাহরাম ছাড়া একাকী উড়োজাহাজে সফর করে থাকে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, মাহরাম পুরুষ তাদেরকে এয়ারপোর্টে বিমানে তুলে দেয় এবং পরবর্তী এয়ারপোর্টে আরেক মাহরাম তাদেরকে রিসিভ করে থাকে। আর

---

[4] বুখারী অধ্যায়: শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদ: নারীর হজ; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজ্জের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

সে তো উড়োজাহাজের মধ্যে নিরাপদেই থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যুক্তিটি অসার। কেননা তার মাহরাম তো এরোপ্লেনে তাকে উঠিয়ে দিতে পারে না। খুব বেশি তাকে ওয়েটিং হলে বা ইমিগ্রেশন পর্যন্ত ছেড়ে আসতে পারে। কখনো প্লেন ছাড়তে দেরী হতে পারে। কখনো কারণবশতঃ গন্তব্য এয়ারপোর্টে প্লেন অবতরণ করা সম্ভব হয় না। তখন এ নারীর কি অবস্থা হবে? কখনো হয়তো গন্তব্য এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করল ঠিকই কিন্তু মাহরাম ব্যক্তিটি তাকে রিসিভ করতে পারল না। হয়তো সে অসুস্থ হয়ে গেল, কোনো সড়ক দুর্ঘটনা হলো ইত্যাদি যে কোনো কারণ ঘটতে পারে।

আবার ধরে নিলাম যে, উল্লিখিত কারণগুলো কোনটিই হলো না। ঠিকঠাক মত প্লেন উড়ল, গন্তব্য এয়ারপোর্টে মাহরাম তাকে রিসিভ করল। কিন্তু এমনও তো হতে পারে- প্লেনের মধ্যে তার সিটের পাশে এমন লোক বসেছে, যে আল্লাহকে ভয় করে না, ফলে সে নারীকে বিরক্ত করতে পারে বা নারীই তার প্রতি আসক্ত হতে পারে। তাহলেই তো নিষিদ্ধ ফেতনার বীয বপন হয়ে গেল- যেমনটি কারো অজানা নয়।

অতএব, নারীর ওপর ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করা এবং কোনো মাহরাম ছাড়া কখনো সফরে বের না হওয়া। অভিভাবক পুরুষদের উপরও ওয়াজিব হচ্ছে, হজে তাদের নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করা, নারীদের ব্যাপারে উদাসীনতার পরিচয় না দেওয়া, নিজেদের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করা। প্রত্যেকে তার পরিবার সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে

জিজ্ঞাসিত হবে। কেননা এদেরকে আল্লাহ তাদের কাছে আমানত রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦﴾ [التحريم: ٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা কখনো আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না। তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তাই করে।” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

সহদোর বোন, তার স্বামী ও মায়ের সাথে উমরায় যাওয়া

প্রশ্ন: (৪৫৯) জনৈক নারীর কথা হচ্ছে, আমি রামদান মাসে উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করেছি। কিন্তু আমার সাথে থাকছে আমার সহদোর বোন, তার স্বামী ও আমার মা। এ উমরায় যাওয়া কি আমার জন্য জায়েয হবে?

উত্তর: এদের সাথে উমরায় যাওয়া আপনার জন্য জায়েয হবেনা; কেননা বোনের স্বামী আপনার মাহরাম নয়। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবায় বলেন,

«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

“কোনো পুরুষ যেন কোনো নারীর সাথে নির্জন না হয়। মাহরাম ছাড়া কোনো নারী যেন সফর না করে।” তখন এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল আমার স্ত্রী হজ আদায় করার জন্য বের হয়ে গেছে। আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধের জন্য নাম লিখিয়েছি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি চলে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ পালন কর।”[৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে কোনো ব্যাখ্যা

---

[5] সহীহ বুখারী অধ্যায়: শিকারের জরিমানা, অনুচ্ছেদ: নারীর হজ; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজের সফরে নারীর সাথে মাহরাম থাকা।

চাইলেন না তোমার স্ত্রীর সাথে কি অন্য কোনো নারী আছে না নেই? সে কি যুবতী না বৃদ্ধা? রাস্তায় সে কি নিরাপদ না নিরাপদ নয়?

প্রশ্নকারী এ নারী মাহরাম না থাকার কারণে যদি উমরায় না যায়, তবে তার কোনো গুনাহ্ হবে না। যদিও ইতোপূর্বে সে কখনো উমরা না করে থাকে। কেননা হজ-উমরা ফরয হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে নারীর মাহরাম থাকা।

প্রশ্ন: (৪৬০) হজের মাস কী কী?

উত্তর: হজের সময় শুরু হয় শাওয়াল মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে এবং শেষ হয় যিলহজের দশ তারিখে তথা ঈদের দিনে বা জিলহজের শেষ তারিখে। এটাই বিশুদ্ধ মত। কেননা আল্লাহ বলেন, ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“হজের মাসসমূহ সুনির্দিষ্ট জানা।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭] এখানে বহুবচন أشهر শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তা হাকীকী অর্থে ব্যবহার হবে। অর্থাৎ এ তিনটি মাসে হজের কাজ চলবে। এ কথার অর্থ এটা নয় যে, এ তিন মাসের যে কোনো দিনে হজের কাজ করতে হবে। [অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথমেই কেউ যদি হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধে এবং তাওয়াফ সা‘ঈ করে, তবে তা হজের জন্যই হল। কিন্তু আরাফাত এবং তৎপরবর্তী কাজের জন্য তো সময় নির্ধারণ করাই আছে।] আর যিলহজের শেষ নাগাদ হজের সময় প্রলম্বিত একথার অর্থ হচ্ছে, হজের তাওয়াফ এবং সা‘ঈ যিলহজের শেষ পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয আছে।

এর পর আর বিলম্বিত করা জায়েয নয়। কিন্তু যদি কোনো ওযর থাকে সে কথা ভিন্ন। যেমন হজের তাওয়াফ করার পূর্বে কোনো নারীর নেফাস শুরু হয়ে গেল। নেফাস অবস্থা শেষ হতে হতে যিলহজ মাস পার হয়ে গেল। তার এ ওযর গ্রহণযোগ্য নেফাস শেষ হলেই সে তাওয়াফ ও সা'ঈ সম্পাদন করবে।

উমরার জন্য কোনো সময় নির্দিষ্ট নেই। বছরের যে কোনো সময় তা সম্পাদন করা যায়। কিন্তু রামাযানে উমরা করলে হজের সমান ছাওয়াব লাভ করা যায়। হজের মাসসমূহেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাবতীয় উমরা আদায় করেন। হুদায়বিয়ার উমরা যিলকদ মাসে। কাযা উমরা আদায় করেছেন যিলকদ মাসে, জি'রানার উমরাও ছিল যিলকদ মাসে। আর বিদায় হজের সাথের উমরাও ছিল যিলকদ মাসে। এতে বুঝা যায় হজের মাসসমূহে উমরা করার আলাদা বৈশিষ্ট্য ও ফযীলত রয়েছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরা আদায় করার জন্য এ মাসগুলোকেই নির্বাচন করেছেন।

প্রশ্ন: (৪৬১) হজের মাসসমূহ আসার পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধার বিধান কী?

উত্তর: হজের মাসসমূহ আসার পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধার ব্যাপারে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

কেউ বলেন, এটা বিশুদ্ধ হবে এবং হজের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে। তবে হজের মাস আগমণ করার পূর্বে হজের ইহরাম বাঁধা মাকরূহ।

দ্বিতীয় মত: তার এ ইহরাম হজের ইহরাম হিসেবে গণ্য হবে না। তবে তা উমরা হয়ে যাবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ»

"উমরা হজের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।"[৬] তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাকে ছোট হজ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন, আমর ইবন হাযমের বিখ্যাত মুরসাল হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, যা লোকেরা সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে।[৭]

প্রশ্ন: (৫৬২) হজের জন্য মীক্বাতের স্থানসমূহ কী কী?

উত্তর: হজের জন্য মীক্বাতের স্থানসমূহ হচ্ছে পাঁচটি: ১) যুল হুলায়ফা ২) জুহ্ফা ৩) ইয়ালামলাম ৪) কারণে মানাযেল ৫) যাতু ঈরক্ব।

১) যুল হুলায়ফা: যাকে বর্তমানে আবা'রে আলী বলা হয়। যা মদীনার নিকটবর্তী। মক্কা থেকে এর অবস্থান ১০ মারহালা দূরে (বর্তমান হিসেবে প্রায় ৪০০ কিঃ মিঃ)। মক্কা থেকে এটি সবচেয়ে দূরে অবস্থিত মীকাত। এটি মদীনাবাসী এবং সেপথ দিয়ে গমণকারী অন্যান্যদের মীক্বাত।

২) জুহ্ফা: শাম তথা সিরিয়াবাসীদের মক্কা গমণের পথে পুরাতন একটি গ্রামের নাম জুহ্ফা। সেখান থেকে মক্কার দূরত্ব ৩ মারহালা। (বর্তমানে প্রায়

[6] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজের মাসসমূহে উমরা করা জায়েয।
[7] দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং ১২২।

১৮৬ কি. মি.)। এটা এখন আর গ্রাম নেই। বর্তমানে লোকেরা এর বদলে পার্শবর্তী স্থান রাবেগ থেকে ইহরাম বাঁধে।

৩) ইয়ালামলাম: ইয়ামানের লোকদের মক্কা আগমণের পথে একটি পাহাড় বা একটি স্থানের নাম ইয়ালামলাম। বর্তমানে এস্থানকে সা'দিয়া বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা। (বর্তমানে প্রায় ৯২ কি. মি.।)

৪) কারণে মানাযেল: নজদ তথা পূর্ব এলাকার অধিবাসীদের মক্কা গমণের পথে তায়েফের কাছে একটি পাহাড়ের নাম। বর্তমানে একে সায়লুল কাবীর বলা হয়। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা (বর্তমানে প্রায় ৭৮ কি. মি.।)

৫) যাতু ইরক্ব: ইরাকের অধিবাসীদের মক্কা আগমণের পথে একটি স্থানের নাম। এখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় দু'মারহালা। (বর্তমানে প্রায় ১০০ কি. মি.।)

প্রথম চারটি মীক্বাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত।[৮] শেষেরটিও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার বর্ণনা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারণকৃত মীক্বাত। যেমনটি

[৮] সহীহ বুখারী অধ্যায়: হজ অনুচ্ছেদ: হজ উমরার জন্য মক্কাবাসীদের মীক্বাত; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ অনুচ্ছেদ: হজ উমরার জন্য মীক্বাতের স্থান।

নাসাঈ ও আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে।[৯] কিন্তু যাতু ইরক্বের ব্যাপারে সহীহ সূত্রে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে। তিনি উহা কূফা ও বসরার অধিবাসীদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। তারা এসে অভিযোগ করল, হে আমীরুল মুমিনীন! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজদবাসীদের জন্য কারণে মানাযেলকে (তায়েফের সাইলুল কাবীর) মীক্বাত নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু আমাদেরকে অনেকটা পথ ঘুরে সেখানে যেতে হয় এবং আমাদের অনেক কষ্ট হয়। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তোমাদের পথে ঐ মীক্বাতের বরাবর কোনো স্থান তোমরা অনুসন্ধান কর। তখন যাতু ইরক্ব মীকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।[১০]

মোটকথা, যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হয় তবে তো কোনো প্রশ্ন নেই। যদি প্রমাণিত না হয়, তবে তা ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি চার খলীফার মধ্যে অন্যতম। যারা ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত এবং তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ওমরের সমর্থনে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে কয়েকটি বিধান নাযিল করেছেন। আয়েশা বর্ণিত হাদীসটি যদি সহীহ হয়, তবে এটাও তাঁর প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থন। তাছাড়া ওমরের নির্দেশ

---

[9] নাসাঈ, অধ্যায়: হজ অনুচ্ছেদ: ইরাকবাসীদের মীকাত; আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ অনুচ্ছেদ: মীকাতের বর্ণনা।

[10] সহীহ বুখারী অধ্যায়: হজ অনুচ্ছেদ: ইরাকবাসীদের জন্য মীকাত হচ্ছে যাতু ইরক্ব।

যুক্তিসংগত। কেননা কোনো মানুষ যদি মীক্বাত থেকে ভিতরে যেতে চায় তবে সেখান থেকেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। কিন্তু এ স্থানের বরাবর কোনো পথ দিয়ে ভিতরে যেতে চাইলে মীক্বাত অতিক্রমকারী হিসেবে উক্ত স্থান থেকেই ইহরাম বাঁধবে।

উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর এ হাদীসে বর্তমান যুগে আমাদের জন্য বিরাট ধরণের উপকার বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, কোনো মানুষ যদি বর্তমান যুগে এরোপ্লেনযোগে হজ বা উমরা করতে আসতে চায়, তবে তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে, যে মীকাতের উপর দিয়ে যাবে তার বরাবর হলেই তাকে ইহরাম বাঁধতে হবে। বিলম্ব করা বৈধ হবে না এবং জেদ্দায় গিয়ে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না (যেমনটি অনেক লোক করে থাকে। কেননা স্থল পথে হোক, বা আকাশ পথে হোক বা সমুদ্র পথে হোক কোনো পার্থক্য নেই) মীকাতের বরাবর হলেই ইহরাম বাঁধতে হবে। এজন্য হজ যাত্রী যে দেশেরই হোক সমুদ্র পথে মক্কা আসতে চাইলে ইয়ালামলাম বা রাবেগের বরাবর হলে তাদেরকে ইহরাম বাঁধতে হবে।

প্রশ্ন: (৪৬৩) বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কী?

উত্তর: বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমকারী দু'প্রকারের লোক হতে পারে:

১। হজ বা উমরা আদায় করার ইচ্ছা করেছে। তাহলে তার উপর আবশ্যক হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে হজ বা উমরার

নিয়তে ইহরাম বেঁধে আসা। যদি এরূপ না করে তাহলে একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে বিদ্বানদের মতে ফিদইয়া বা জরিমানা দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া।

২। হজ বা উমরার উদ্দেশ্য ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা। এ অবস্থায় তার কোনো অসুবিধা নেই। চাই মক্কায় দীর্ঘ সময় অবস্থান করুক বা স্বল্প সময়। কেননা এ অবস্থায় যদি ইহরাম আবশ্যক করা হয় তবে প্রতিবার আগমণে হজ বা উমরা তার উপর আবশ্যক হয়ে যায়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবনে একবারের বেশি হজ বা উমরা আবশ্যক নয়। এর বেশি হলে সবই হবে নফল। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রমের ব্যাপারে বিদ্বানদের বিভিন্ন মতামতের মধ্যে এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

প্রশ্ন: (৪৬৪) 'লাব্বাইক' বলাটাই কি ইহরামে প্রবেশ করার নিয়ত?

উত্তর: হজ বা উমরার কাজে প্রবেশ করার জন্য অন্তরে নিয়ত (ইচ্ছা বা সংকল্প) করে পাঠ করবে: 'লাববাইকা উমরাতান' আর হজের জন্য বলবে, 'লাববাইকা হজ্জান্'। কিন্তু এরূপ বলা জায়েয নয়: 'আল্লাহুম্মা ইন্নী উরীদুল উমরাতা' অথবা 'উরীদুল হাজ্জা'। বা নাওয়াইতু আন আ'তামিরা উমরাতান্। বা নাওয়াইতু আন আহুজ্জা হাজ্জান্। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এগুলো প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন: (৪৬৫) আকাশপথে আগমণকারী কীভাবে ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর: হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে আকাশ পথে আগমণকারী যে স্থানের উপর দিয়ে যাবে সে এলাকার মীকাতের বরাবর হলে ইহরাম বাঁধবে।

তাই গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে প্রথমে বাড়িতেই প্রস্তুতি নিবে। তারপর মীক্বাত পৌঁছার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে। মীকাতের বরাবর পৌঁছলেই অন্তরে নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে ফেলবে। দেরী করবে না। কেননা এরোপ্লেন দ্রুত চলে। মিনিটেই অনেক পথ এগিয়ে যায়। অনেক মানুষ এক্ষেত্রে ভুল করে। পূর্ব প্রস্তুতি থাকে না। "আমরা মীকাতের বরাবর পৌঁছেছি" প্লেনের ক্রুর এ ঘোষণা শোনার পর তাড়াহুড়া শুরু করে। পরনের কাপড় খুলে ইহরামের কাপড় পরিধান করে। এটি মারাত্মক ভুল।

অবশ্য প্লেনের দায়িত্বশীল অফিসারের উচিৎ হচ্ছে, মীকাতের বরাবর পৌঁছার কমপক্ষে ১৫ মিনিট পূর্বে ঘোষণা দেওয়া। যাতে করে লোকেরা সতর্ক হয় এবং ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। তবে হাজী সাহেবগণ যদি প্লেনে উঠার পূর্বে ইহরামের কাপড় পরিধান করে নেন, তাহলে এটা তাদের জন্য অতি উত্তম হয়। মীকাতের বরাবর হলে সংকেত বা ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথেই তারা ইহরামের দো'আ পড়ে ইহরাম বেঁধে ফেলবেন।

প্রশ্ন: (৪৬৬) উমরার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম করার বিধান কী?

উত্তর: যে ব্যক্তি হজ বা উমরার উদ্দেশ্যে মীকাত অতিক্রম করতে চায় সে যেন ইহরাম ছাড়া অতিক্রম না করে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মদীনাবসীগণ ইহরাম বাঁধবে যুল

হুলায়ফা থেকে..।”[১১] অর্থাৎ তাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধা। বিনা ইহরামে মীকাত অতিক্রম না করা। যদি করেই ফেলে তবে ওয়াজিব হচ্ছে মীকাতে ফিরে গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা গমণ করা। এতে তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। কিন্তু যদি ফিরে না আসে এবং মীকাত অতিক্রম করার পর ইহরাম বাঁধে তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদইয়া দিতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি ছাগল কুরবানী করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেয়া।

---

[11] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: মদীনাবাসীদের মীকাত।

উড়োজাহাজে কীভাবে সালাত আদায় করবে এবং ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর: প্রথমতঃ উড়োজাহাজে সালাত পড়ার পদ্ধতি:

1) নফল সালাতের পদ্ধতি হচ্ছে, বিমানের সিটে বসে বসেই সালাত আদায় করবে। ইশারার মাধ্যমে রুকু-সাজদাহ করবে। সাজদাহর জন্য রুকুর চাইতে একটু বেশি মাথা ঝুকাবে।

2) সময় হলেই উড়োজহাজের উপর সালাত আদায় করা ওয়াজিব। কিন্তু সালাতের নির্দিষ্ট সময় বা দু'সালাত একত্রিত করার সময় শেষ হওয়ার আগেই যদি বিমান অবতরণ করার সম্ভাবনা থাকে, আর যমীনে থাকাবস্থায় যেভাবে সালাত আদায় করতে হয় সেভাবে যদি বিমানের উপর সম্ভব না হয়, (যেমন, কিবলামুখী হওয়া, রুকু', সাজদাহ, কওমা ও বসা প্রভৃতি করা যদি সম্ভব না হয়) তবে সেখানে ফরয সালাত আদায় করবে না, বরং অবতরণ করার পর যমীনে সালাত আদায় করবে।

যেমন, জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে সূর্যাস্তের পূর্বে বিমান উড্ডয়ন করল। এখন আকাশে থাকাবস্থায় মাগরিব সালাত আদায় করবে না। পরবর্তী এয়ারপোর্টে বিমান অবতরণ করার পর সালাত পড়বে; কিন্তু যদি দেখে যে, মাগরিব সালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, তবে এশা সালাতের সাথে মাগরিবকে একত্রিত করার নিয়ত করে নিবে। অতঃপর অবতরণ করে মাগরিব সালাতকে দেরী করে এশার সময়ে একত্রিত আদায় করবে। কিন্তু যদি বিমান চলতেই থাকে- অবতরণের সম্ভাবনা না থাকে এবং এশা সালাতেরও সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা

হয়, তবে বিমানের উপরেই সময় অতিক্রম হওয়ার আগেই মাগরিব ও এশা সালাত একত্রিত আদায় করে নিবে।

3) বিমানের উপর ফরয সালাত পড়ার পদ্ধতি হচ্ছে, কিবলামুখী দণ্ডায়মান হয়ে তাকবীর দিবে। ছানা, সূরা আল-ফাতিহা ও অন্য কোনো সূরা বা আয়াত পাঠ করে রুকু করবে। রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে সাজদাহ করবে। নিয়ম মাফিক সাজদাহ করতে সক্ষম না হলে বসে পড়বে এবং বসাবস্থায় ইঙ্গিতের মাধ্যমে সাজদাহ করবে। সালাত শেষ করা পর্যন্ত এরূপই করবে। আর পূর্ণ সময় কিবলামুখী হয়েই থাকবে। কিন্তু কিবলা চিনতে না পারলে বা নির্ভরযোগ্য কেউ তাকে কিবলার সন্ধান দিতে না পারলে নিজ অনুমান ও গবেষণা অনুযায়ী সালাত আদায় করলে কোনো অসুবিধা হবে না।

4) উড়োজাহাজে মুসাফির সালাত কসর করবে। চার রাকাত বিশিষ্ট সালাত দু'রাকাত করে আদায় করবে।

দ্বিতীয়তঃ উড়োজাহাজে হজ বা উমরার ইহরাম বাঁধার পদ্ধতি:

1) এয়ারপোর্টে আসার আগেই গোসল, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করবে এবং এয়ারপোর্টে এসে ইহরামের কাপড় পরিধান করবে।

2) প্লেন মীকাতের নিকটবর্তী হলে যদি ইহরামের কাপড় পরিধান না করে থাকে তবে পরিধান করবে।

3) মীকাতের বরাবর হলেই অন্তরে নিয়ত করে হজ বা উমরার জন্য তালবিয়া পড়ে ইহরামে প্রবেশ করবে।

4) মীকাতের বরাবর হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বেই যদি সতর্কতাবশতঃ বা খেয়াল থাকবে না এ ভয়ে ইহরাম বেঁধে নেয়, তাতেও কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: (৪৬৭) কোনো ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে জেদ্দা সফর করে অতঃপর উমরা আদায় করার ইচ্ছা করে। সে কি জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে?

উত্তর: এ মাসআলাটির দু'টি অবস্থা:

প্রথমঃ লোকটি উমরার নিয়ত না করে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বা কাজে জেদ্দা সফর করেছে। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর উমরা করার ইচ্ছা হয়েছে, তবে সে জেদ্দা থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুএর হাদীসে মীক্বাতের আলোচনায় বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি এ মীক্বাতসমূহের মধ্যে অবস্থান করে, সে যেখানে আছে সেখান থেকেই ইহরাম বাঁধবে। এমনকি মক্কাবাসীগণ মক্কা থেকেই ইহরাম বাঁধবে।"[১২]

দ্বিতীয়ঃ দৃঢ়ভাবে উমরার নিয়ত করেই জেদ্দা সফর করেছে। তাহলে যে মীক্বাতের নিকট দিয়ে গমণ করবে তাকে অবশ্যই সেখান থেকে ইহরাম বাঁধতে হবে। জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধা জায়েয হবে না। কেননা জেদ্দার

---

[12] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজ উমরার জন্য মক্কাবাসীর মীক্বাত।

অবস্থান মীক্বাতের সীমানার মধ্যে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মীক্বাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন,

«هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

"এগুলো স্থান সেখানকার অধিবাসীদের জন্য এবং যারা এর বাইরে থাকে সেখান দিয়ে যেতে চায় তাদের জন্য ইহরাম বাঁধার মীক্বাত- যারা হজ ও উমরা করার ইচ্ছা পোষণ করে।"[১৩]

যদি জেদ্দা থেকে ইহরাম বাঁধে এবং মক্কা প্রবেশ করে, তবে বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদইয়াস্বরূপ মক্কায় একটি দম প্রদান করতে হবে এবং তার গোশত মক্কার ফক্বীর-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। তাহলেই তার উমরা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

জেদ্দা যাওয়ার আগে যদি উমরার নিয়ত করে থাকে এবং বিনা ইহরামে জেদ্দা প্রবেশ করে, তবে নিকটবর্তী কোনো মীকাতে ফেরত গিয়ে সেখান থেকে ইহরাম বাঁধবে। এতে কোনো ফিদইয়া লাগবে না।

প্রশ্ন: (৪৬৮) ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর গোসল করার বিধান কী?

---

[13] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: মীক্বাতের ভিতরে যারা থাকে তাদের মীক্বাত। হাদীস নং ১৫২৯।

উত্তর: ইহরামে প্রবেশ করার পর গোসল করতে কোনো বাধা নেই। কেননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত রয়েছে। চাই একবার গোসল করুক বা দু'বার। কিন্তু ইহরাম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে জানাবাতের (নাপাকীর) গোসল করা ওয়াজিব। আর ইহরাম বাঁধার সময় গোসল করা সুন্নাত।

প্রশ্ন: (৪৬৯) মৃত দাদার পক্ষ থেকে হজ করার বিধান কী? অবশ্য তার পক্ষ থেকে হজ আদায়কারী নিজের হজ সম্পাদন করেছে।

উত্তর: যে মৃত দাদা নিজের হজ করে নি তার পক্ষ থেকে হজ সম্পাদন করা জায়েয। কেননা সুন্নাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে।

প্রশ্ন: (৪৭০) ইহরামের জন্য বিশেষ কোনো সালাত আছে কী?

উত্তর: ইহরামের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সালাত নেই। কিন্তু কোনো লোক যদি এমন সময় মীক্বাতে পৌঁছে যখন ফরয সালাতের সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তার জন্য উত্তম হচ্ছে ফরয সালাত সম্পাদন করার পর ইহরাম বাঁধা।

ফরয সালাতের সময় নয় কিন্তু চাশতের সালাতের (সালাতে দুহা) সময়ে মিক্বাতে পৌঁছলো, তাহলে প্রথমে পরিপূর্ণরূপে গোসল করবে, সুগন্ধি মাখবে, ইহরামের কাপড় পরিধান করে চাশতের নিয়তে সালাত আদায় করবে তারপর ইহরামের নিয়ত করবে। চাশত সালাতের সময় না হলে তাহিয়্যাতুল অযুর নিয়ত করে দু'রাকাত সালাত পড়ে ইহরামে প্রবেশ

করা উত্তম। কিন্তু ইহরামের নিয়তে সালাত আদায় করার কোনো দলীল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই।

প্রশ্ন: (৪৭১) কোনো ব্যক্তি যদি হজের মাসে উমরা আদায় করে মদীনা সফর করে, অতঃপর যুলহুলায়ফা থেকে হজের ইহরাম বাঁধে, তবে সে কি তামাত্তু‘কারীরূপে গণ্য হবে?

উত্তর: যখন কিনা এ ব্যক্তি হজের মাসে উমরা সম্পাদন করে এবছরেই হজ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করেছে, তখন সে তামাত্তু‘কারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উমরা ও হজের মধ্যবর্তী কোনো সফর তামাত্তু‘কে বাতিল করবে না। তবে যদি উমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত যায় এবং সেখান থেকে হজের উদ্দেশ্যে সফর করে, তবে তার তামাত্তু‘ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কেননা প্রত্যেকটি কাজ সে আলাদা আলাদা সফরে সম্পাদন করেছে। অতএব, উমরা সম্পাদন করার পর যে লোক মদীনা সফর করে যুলহুলায়ফা থেকে হজের ইহরাম বাঁধবে, সে তামাত্তু‘ হজকারী হিসেবে হাদঈ যবাই করবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“যে ব্যক্তি হজের সাথে উমরা করার নিয়ত করবে, সে সাধ্যানুযায়ী হাদঈ যবাই করবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

প্রশ্ন: (৪৭২) কোনো ব্যক্তি যদি শাওয়াল মাসে উমরার ইহরাম বেঁধে উমরা পূর্ণ করে। কিন্তু সে সময় সে হজের নিয়ত করে নি। কিন্তু হজের সময় তার হজ করার সুযোগ হল। সে কি তামাত্তু‘কারী গণ্য হবে?

উত্তর: না, সে তামাত্তু‘কারী গণ্য হবে না। অতএব, তাকে হাদঈও দিতে হবে না।

তালবিয়ার সুন্নাতী নিয়ম

প্রশ্ন: (৪৭৩) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি কী? উমরা এবং হজের ক্ষেত্রে কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে?

উত্তর: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত তালবিয়াটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

«لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ».

“লাববাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাববাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি’মাতা লাকা ওয়াল মুলক্, লা শারীকা লাক।”[১৪] ইমাম আহমাদ একটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন, “লাব্বাইকা ইলাহাল হক্ক।” এর সনদ হাসান।

উমরার ক্ষেত্রে তাওয়াফ শুরুর পূর্বে তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করবে। আর হজের ক্ষেত্রে দশ তারিখে ঈদের দিন জামরা আকাবায় পাথর মারার পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে। তিরমিযীতে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাতে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময়

---

[14] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: তালবিয়া; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: তালবিয়া ও তার পদ্ধতি।

তালবিয়া বলা বন্ধ করতেন।”[১৫] ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেন। কিন্তু এর সনদে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর্ রহমান ইবন আবু লায়লা নামক জনৈক বর্ণনাকারী আছে। অধিকাংশ হাদীস বিশারদ তাকে দুর্বল বলেছেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরো বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফা থেকে মুযদালিফা আসার পথে তাঁর আরোহীর পিছনে উসামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বসিয়েছিলেন। মুযদালিফা থেকে মিনা যাওয়ার পথে ফাদ্ল ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে পিছনে বসিয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে (উসামা ও ফাযল) বলেছেন, তিনি জামরা আকাবা বা বড় জামরায় কঙ্কর মারার পূর্ব পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করতে থেকেছেন।[১৬]

ইমাম মালেকের মতে, হারাম শরীফে পৌঁছার সাথে সাথে তালবিয়া বলা বন্ধ করবে। কেউ কেউ বলেছেন, বায়তুল্লাহর কাছে পৌঁছলে বা কাবা ঘর দেখলেই তালবিয়া বলা বন্ধ করবে।

লাব্বাইক বলার অর্থ হচ্ছে: আপনার আনুগত্যের কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আপনার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছি।

প্রশ্ন: (৪৭৪) ইহরাম বেঁধে কি মাথা আঁচড়ানো জায়েয আছে?

---

[15] আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কখন তালবিয়া পাঠ করা বন্ধ করতে হবে; তিরমিযী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: উমরাতে কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে।

[16] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজে আরোহণ করা একে অপরের পিছনে আরোহণ করা।

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় মাথা আঁচড়ানো উচিৎ নয়। কেননা ইহরামকারীর উচিৎ হচ্ছে এলোকেশ ও ধুলোমলিন থাকা। তবে গোসল করতে কোনো অসুবিধা নেই। তাছাড়া মাথা আঁচড়ালে চুল পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ইহরামকারী মাথা বা শরীর প্রভৃতি চুলকালে যদি কোনো চুল পড়ে যায়, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সে ইচ্ছাকৃত চুল উঠায়নি। জেনে রাখা উচিৎ যে, ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ ভুলক্রমে করে ফেলে, তবে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا﴾ [الاحزاب: ٥]

“তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। কিন্তু সে ব্যাপারে তোমাদের অন্তরে সংকল্প থাকলে অপরাধ হবে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম করুণাময়।” [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“হে আমাদের রব! যদি আমাদের ভুল হয় বা ত্রুটি হয় তজ্জন্যে আমাদেরকে ধৃত করবেন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

ইহরামের অন্যতম নিষিদ্ধ কাজ শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ مِّثۡلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحۡكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ﴾ [المائدة: ٩٥]

“হে মুমিনগণ! তোমরা ইহরাম অবস্থায় বন্য শিকারকে হত্যা করো না; আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক তাকে হত্যা করবে, তার উপর তখন জরিমানা ওয়াজিব হবে, যা মূল্যের দিক দিয়ে সেই জানোয়ারের সমতুল্য হয়, যাকে সে হত্যা করেছে। তার অনুমানিক মূল্যের মীমাংসা তোমাদের মধ্যে হতে দু’জন নির্ভরযোগ্য লোক করে দেবে।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

এ আয়াতে ‘ইচ্ছাপূর্বক’ শব্দ উল্লেখ করাতে বুঝা যায়- যদি অনিচ্ছাকৃত হত্যা করে ফেলে, তবে তাকে কোনো জরিমানা দিতে হবে না। এ বিধানই ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কেননা ইসলাম ধর্ম ক্ষমা ও সহজতার বৈশিষ্টে অনন্য।

অতএব, কোনো ব্যতিক্রম ছাড়াই ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ বা ভুলবশতঃ করে ফেলে, তবে তার বিরুদ্ধে কোনো বিধান প্রজোয্য হবে না, কোনো ফিদইয়া আবশ্যক হবে না- এমনকি স্ত্রী সহবাস করে ফেললেও হজ বিনষ্ট হবে না। উল্লিখিত শরী‘আতের দলীলের দাবী অনুযায়ী এটাই বিশুদ্ধ কথা।

প্রশ্ন: (৪৭৫) অজ্ঞতাবশতঃ মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেলে তার উপর আবশ্যক কী?

উত্তর: অজ্ঞতাবশতঃ যে হাজী সাহেব মাথা থেকে সামান্য চুল কেটে হালাল হয়ে গেছে, তার উপর কোনো কিছু আবশ্যক নয়। কেননা সে অজ্ঞ। তবে জানার পর তাকে পূর্ণ মাথা থেকে চুল কাটতে হবে।

এ উপলক্ষে আমি মুসলিম ভাইদেরকে নসীহত করতে চাই, কোনো ইবাদত করতে চাইলে, তার সীমারেখা ও নিয়ম-নীতি না জেনে তাতে লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। যাতে করে অজ্ঞতাবশতঃ এমন কিছু না করে ফেলে যাতে ইবাদতটিই নষ্ট হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ তা‘আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেন,

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٨]

“আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ আল্লাহর দিকে বুঝে-শুনে দা’ওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০৮]

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ﴾ [الزمر: ٩]

“আপনি বলুন, যারা জানে এবং জানে না তারা কি এক বরাবর? বুদ্ধিমানরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৯]

অতএব, একজন লোক বুঝে-সুঝে আল্লাহর সীমারেখা জেনে-শুনে তাঁর ইবাদত করবে এটা খুবই উত্তম। অজ্ঞতার সাথে বা মানুষের অন্ধানুসরণ করে আল্লাহর ইবাদত করা উচিৎ নয়। কেননা না জেনে ইবাদত করতে গেলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন বেশি তেমনি যাদের অনুসরণ করবে তাদের মধ্যে জ্ঞান থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে।

প্রশ্ন: (৪৭৬) প্রশাসনকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করে মক্কায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধলে হজ বিশুদ্ধ হবে কী?

উত্তর: তার হজ তো বিশুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু মুসলিম শাসককে ফাঁকি দেওয়ার জন্য সে হারাম কাজ করেছে। এটা হারাম হয়েছে দু'কারণেঃ

প্রথমতঃ আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করেছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুসলিম শাসকের আনুগত্য করার। অবশ্য আল্লাহর নাফরমানীর কাজে তাদের আনুগত্য করা যাবে না। অতএব, তার উপর আবশ্যক হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাওবা করা। আর ফিদইয়া প্রদান করা অর্থাৎ একটি দম তথা কুরবানী করার মত পশু যবাই করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কেননা সে মীক্বাত থেকে ইহরাম বাঁধেনি। বিদ্বানদের মতে হজ বা উমরার কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে তার জন্য ফিদইয়া প্রদান করা আবশ্যক।

প্রশ্ন: (৪৭৭) তামাত্তু'কারী যদি নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার হজের জন্য সফর করে, তবে কি ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তামাত্তু'কারী উমরা আদায় করার পর নিজ দেশে ফেরত গিয়ে আবার সেই বছর হজের জন্য মক্কা সফর করলে সে ইফরাদকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা নিজ পরিবারের কাছে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে হজ ও উমরার মাঝে বিচ্ছিন্নতা করেছে। আবার সফর শুরু করার অর্থ হচ্ছে সে হজের জন্য নতুনভাবে সফর করছে। তখন তার এ হজ ইফরাদ হিসেবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তামাত্তু'কারীর মতো হাদঈ যবাই করা তার ওপর ওয়াজিব হবে না। কিন্তু নিজ দেশে ফিরে যাওয়াটা যদি তার হাদঈ রহিত করার বাহানা হয়, তবে হাদঈ রহিত হবে না। কেননা কোনো ওয়াজিব রহিত করার বাহানা করলে উহা রহিত হবে না।

প্রশ্ন: (৪৭৮) ইহরাম অবস্থায় ছাতা ব্যবহার করার বিধান কী? অনুরূপভাবে সিলাইকৃত বেল্ট ব্যবহার করা যাবে কী?

উত্তর: সূর্যের তাপ বা বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য ছাতা ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো ক্ষতি নেই। একাজ হাদীসে পুরুষের মাথা ঢাকার নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এটা মাথা ঢাকা নয়; বরং তা রৌদ্র প্রভৃতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ছায়া গ্রহণ করা। সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত হয়েছে, বিদায় হজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উসামা ইবন যায়েদ ও বেলাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ছিলেন। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনির লাগাম ধরে ছিলেন। অপরজন একটি কাপড় উপরে উঠিয়ে তাঁকে ছায়া প্রদান

করছিলেন, এভাবে চলতে চলতে তিনি জামরা আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলেন।[১৭] এ হাদীস থেকে দলীল পাওয়া যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় হালাল হওয়ার পূর্বে কাপড় দিয়ে ছায়া গ্রহণ করেছেন।

পরনের কাপড় বাঁধার জন্য যে কোনো ধরণের বেল্ট ব্যবহার করাতে কোনো অসুবিধা নেই। আর 'সেলাইকৃত বেল্ট' প্রশ্নকারীর এ কথাটি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল থেকে উৎপত্তি হয়েছে। তাদের ধারণা, যে কোনো প্রকারের সিলাই থাকলেই তা আর পরিধান করা যাবে না। কিন্তু কথাটি ভুল। 'সিলাইকৃত কাপড় পরিধান করা যাবে না' একথা দ্বারা বিদ্বানগণ বুঝিয়েছেন এমন সব কাপড় পরিধান করা যা শরীরের মাপে বানানো হয়েছে। সাধারণভাবে পোষাক হিসেবে যা পরিধান করা হয়। যেমন, জামা, পায়জামা, গেঞ্জি, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি। একারণে কোনো মানুষ যদি এমন চাদর বা লুঙ্গি পরিধান করে যা জোড়া-তালি দেওয়া আছে, তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই- এমনকি যদি তার উভয় প্রান্ত সেলাই করা থাকে তাতেও কোনো ক্ষতি হবে না।

---

[17] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কুরবানীর দিন আরোহী অবস্থায় জামরা আকাবায় কঙ্কর মারা মুস্তাহাব।

প্রশ্ন: (৪৭৯) শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কীভাবে ইহরাম করবে?

উত্তর: কোনো মানুষ যদি ইহরামের কাপড় পরিধান করতে সক্ষম না হয়, তবে যে ধরণের কাপড় পরতে সক্ষম হবে তাই পরিধান করবে। তখন বিদ্বানদের মতেঃ

ক) তাকে ফিদইয়া হিসেবে একটি দম প্রদান করে মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

খ) অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' তথা সোয়া কেজি পরিমাণ খাদ্য দিবে।

গ) অথবা তিনদিন সাওম পালন করবে।

রোগের কারণে মাথা মুণ্ডন করতে বাধ্য হলে যে বিধান প্রজোয্য হয়, তার ওপর কিয়াস করে বিদ্বানগণ উক্ত সমাধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"কোনো লোক যদি পীড়িত হয় বা তার মাথা যন্ত্রনাগ্রস্ত হয়, তবে সে সাওম কিংবা সাদকা অথবা কুরবানী দ্বারা তার বিনিময় (ফিদ্ইয়া) আদায় করবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

আর সাওম ও সাদকার বিষয়টি পূর্বে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্ন: (৪৮০) ইহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা হারাম এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে কেউ যদি স্ত্রী সহবাস করে ফেলে, তবে তার হজের বিধান কী?

উত্তর: একথা সুবিদিত যে, স্ত্রী সহবাস ইহরামের নিষিদ্ধ বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম; বরং তা ইহরামের সর্বাধিক কঠিন ও বড় নিষেধাজ্ঞা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]

“হজের মাসসমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করবে, তার পক্ষে স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া জায়েয নয়। জায়েয নয় কোনো অশোভন কাজ করা, না কোনো ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

الرفث এর অর্থ হচ্ছে, সহবাস ও তার পূর্বের কাজসমূহ। অতএব, ইহরামের সর্বাধিক কঠিন নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। হজের ইহরামে থেকে কোনো লোক যদি স্ত্রী সহবাস করে, তবে হয় তা প্রথম হালালের পূর্বে হবে অথবা প্রথম হালালের পর হবে। (অর্থাৎ ১০ তারিখে বড় জামরায় কংকর মেরে মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে) যদি প্রথম হালালের পূর্বে সহবাস হয়, তবে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবে:

প্রথমতঃ তার ঐ হজ বাতিল হয়ে যাবে। চাই তা ফরয হজ হোক বা নফল হজ হোক।

দ্বিতীয়তঃ সে গুনাহগার হবে।

তৃতীয়তঃ হজের অবশিষ্ট কাজ তাকে পূর্ণ করতে হবে। অর্থাৎ হজ নষ্ট হওয়া সত্বেও হজের অবশিষ্ট কাজগুলো পরিপূর্ণরূপে আদায় করতে হবে।

চতুর্থতঃ পরবর্তী বছর অবশ্যই তাকে উক্ত হজের কাযা আদায় করতে হবে। চাই তা ফরয হজ হোক বা নফল হজ হোক। হজ ফরয হলে তো কাযা আদায় করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। কেননা সহবাসে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে সে হজের ফরযিয়াতের যিম্মা মুক্ত হতে পারে নি।

কিন্তু নফল হজ হলেও তাকে কাযা আদায় করতে হবে। কেননা হজ আরম্ভ করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরাকে পূর্ণ কর।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

তাছাড়া হজের কাজ শুরু করলে তা ফরয হয়ে যায়। যেমনটি পূর্বের আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন। “হজের মাসসমূহ নির্দিষ্ট সুবিদিত। এসব মাসে যে ব্যক্তি হজ ফরয করবে...।” এ জন্য আমরা বলব, হজ

নফল হোক বা ফরয হোক, যে কোনো কারণে তা বিনষ্ট করে ফেললে তার কাযা আদায় করতে হবে।

পঞ্চমতঃ কাফফারাস্বরূপ তাকে জরিমানা আদায় করতে হবে। আর তা হচ্ছে একটি উট যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া। উটের পরিবর্তে যদি সাতটি ছাগল যবেহ করে তাও জায়েয আছে।

এই বিধান হচ্ছে প্রথম হালালের পূর্বে হলে। (অর্থাৎ ১০ তারিখে বড় জামরায় কংকর মেরে মাথা মুণ্ডন করার পূর্বে) কিন্তু প্রথম হালালের পর সহবাস করলে তার উপর নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আবশ্যক হবেঃ

প্রথমতঃ সে গুনাহগার হবে।

দ্বিতীয়তঃ ইহরাম বিনষ্ট হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ কাফফারা হিসেবে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের কোনো একটি করবে:

ক) একটি ছাগল যবেহ করে হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে। অথবা

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা' পরিমাণ খাদ্য দিবে। অথবা

গ) তিন দিন সাওম রাখবে।

এ তিনটির যে কোনো একটি জরিমানাস্বরূপ আদায় করবে।

চতুর্থতঃ নতুন করে ইহরামে প্রবেশ করবে। মক্কার হারাম সীমানার বাইরে নিকটতম কোনো স্থানে গমণ করে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে আসবে এরপর তাওয়াফে ইফাদ্বা বা হজের তাওয়াফ সম্পন্ন করবে। এভাবেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন।

যদি প্রশ্ন করা হয়: প্রথম হালাল হওয়ার অর্থ কী?

জবাবঃ হাজী সাহেব যখন ঈদের দিন (যিল্ হজের দশ তারিখে) বড় জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করে তখন সে প্রথম হালাল হয়ে যায়। তখন স্ত্রী সহবাস ব্যতীত ইহরামের যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যায়। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহরাম বাঁধার পূর্বে এবং হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহর তাওয়াফের পূর্বে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।'[১৮] এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, হালাল হওয়ার পরেই আছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ। যেমনটি পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, ঈদের দিন বড় জামরায় কঙ্কর মারার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল খাটো করার মাধ্যমে প্রথম হালাল হবে। এ হালালের পূর্বে সহবাস হলে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় আবশ্যক হবে। আর এ হালালের পর সহবাস হলে, উল্লিখিত চারটি বিষয় আবশ্যক হবে।

---

[18] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: ইহরামকারীর ইহরামের সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা।

কোনো লোক যদি মূর্খতাবশতঃ এ কাজ করে অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম একথা তার জানা নেই, তবে তার কোনো ক্ষতি হবে না। কোনো কাফফারা দিতে হবে না। চাই প্রথম হালালের পূর্বে হোক বা পরে হোক। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"হে আমাদের রব আমরা যদি ভুলক্রমে কোনো কিছু করে ফেলি অথবা ভুলে যাই তবে আমাদেরকে পাকড়াও করো না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [الاحزاب: ٥]

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো গুনাহ্ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

যদি প্রশ্ন করা হয়: ইহরাম অবস্থায় সহবাস করা হারাম এ লোক যদি একথা জানে কিন্তু এটা জানে না যে, সহবাস করলে এত কিছু আবশ্যক হবে বা এ জরিমানা দিতে হবে, জানলে হয়তো সে একাজে লিপ্ত হতো না। তবে এর বিধান কী? তার এ অজ্ঞতার ওযর কি গ্রহণযোগ্য হবে?

জবাব: তার এ ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা ওযর হচ্ছে, বিষয়টি সম্পর্কে সম্পর্ণরূপে অজ্ঞ থাকা। বিষয়টি যে হারাম সে ব্যাপারে তার কোনই জ্ঞান না থাকা। কিন্তু বিষয়টি হালাল না হারাম এ বিধান জানার পর, করলে কি লাভ বা না করলে কি ক্ষতি তা জানা আবশ্যক নয়। এ ধরনের না জানা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না।

যেমন, জনৈক বিবাহিত ব্যক্তি যদি জ্ঞান রাখে যে, ব্যভিচার হারাম। সে বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক। সে যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে অবশ্যই তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করতে হবে। সে যদি বলে যে, ব্যভিচার করলে যে রজমের শাস্তি আছে আমি তা জানতাম না। জানলে এ অন্যায় আমি করতাম না, তার এ কথা গ্রহণ করা হবে না। তাকে রজম করতেই হবে।

এ কারণে জনৈক ব্যক্তি রামাযানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার করণীয় কি জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে কাফফারা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন। অথচ সহবাস করার সময় সে কাফফারা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এথেকে বুঝা যায়, কোনো মানুষ যদি অন্যায়ে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমা লঙ্ঘন করে, তখন উক্ত অপরাধের শাস্তি তাকে পেতে হবে। যদিও এর শাস্তি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে।

প্রশ্ন: (৪৮১) ইহরাম অবস্থায় নারী কীভাবে পর্দা করবে? পর্দা মুখ স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোনো শর্ত আছে কী?

উত্তর: ইহরাম অবস্থায় নারী যদি মাহরাম নয় এমন কোনো পুরুষের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে বা তার নিকট কোনো পুরুষ অতিক্রম করে, তবে অবশ্যই স্বীয় মুখমণ্ডল ঢেকে নিবে। যেমনটি মহিলা সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু করতেন। একারণে তাকে কোনো ফিদইয়া দিতে হবে না। কেননা পরপুরুষের সামনে মুখমণ্ডল ঢাকা আল্লাহর নির্দেশ। আর নির্দেশ কখনো নিষেধ হতে পারে না।

পর্দা মুখমণ্ডল স্পর্শ করতে পারবে না এরকম কোনো শর্ত নেই। এতে কোনো অসুবিধা নেই। পরপুরুষের সামনে এলেই তাকে অবশ্যই মুখ ঢাকতে হবে। কিন্তু যদি খিমা বা তাঁবুতে অবস্থান করে এবং সেখানে কোনো পরপুরুষ না থাকে, তবে মুখমণ্ডল খোলা রাখবে। কেননা ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য শরী'আতের নির্দেশ হচ্ছে মুখ খোলা রাখা।

প্রশ্ন: (৪৮২) নারী বিদায়ী তাওয়াফ করার পূর্বে ঋতুবতী হয়ে পড়লে করণীয় কী?

উত্তর: যদি সে তাওয়াফে ইফাদ্বাসহ হজের যাবতীয় কাজ পূর্ণ করে থাকে এবং শুধুমাত্র বিদায়ী তাওয়াফ বাকী থাকে, তারপর ঋতুবতী হয় তবে বিদায়ী তাওয়াফ রহিত হয়ে যাবে। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ».

“লোকদের আদেশ দেওয়া হয়েছে, কাবা ঘরের তাওয়াফ যেন তাদের সর্বশেষ কাজ হয়। তবে বিষয়টি ঋতুবতীদের জন্য হালকা করে দেওয়া হয়েছে।’[১৯] যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো যে, উম্মুল মু‘মেনীন ছাফিয়া বিনতে হুওয়াই রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা ঋতুবতী হয়ে গেছেন। অবশ্য তিনি তাওয়াফে ইফাদ্বা বা হজের তাওয়াফ করে নিয়েছেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাহলে তোমরা বের হয়ে যাও।”[২০] তিনি তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফকে রহিত করে দিলেন।

কিন্তু তাওয়াফে ইফাদ্বা বা হজের তাওয়াফ ঋতুবতীর জন্য রহিত হবে না। ঋতুবতী হয় মক্কায় থেকে অপেক্ষা করবে এবং পবিত্র হলে তাওয়াফে ইফাদ্বা করবে। অথবা সে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে কিন্তু ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে এবং পবিত্র হলে মক্কায় ফিরে এসে শুধুমাত্র হজের তাওয়াফ করবে। যদি নিজ দেশে চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে, তবে সুন্দর হয়- প্রথমে উমরা করে নিবে (তাওয়াফ করবে, সা‘ঈ করবে এবং চুল খাট করবে) তারপর হজের তাওয়াফ করবে।

উল্লিখিত পন্থার কোনটিই যদি সম্ভব না হয়, তবে লজ্জাস্থানে প্যাড বা

---

[19] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

[20] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজ্জের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে। মুসলিম অধ্যায়ঃ হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

এজাতীয় কোনো কিছু দিয়ে বেঁধে দিবে যাতে করে স্রাবের রক্ত মসজিদে না পড়ে, তারপর হজের তাওয়াফ করে নিবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এটা একান্ত জরুরী অবস্থা।

ঋতুবতী নারী পবিত্রতায় সন্দেহ হলে দ্বিতীয়বার উমরা করে নিবে

প্রশ্ন: (৪৮৩) জনৈক নারী স্বামীর সাথে ঋতু অবস্থাতেই ইহরাম বাঁধে। কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর কোনো মাহরাম ছাড়াই সে উমরার কাজ সমাধা করে। কাজ শেষ হলে আবার রক্তের চিহ্ন পাওয়া যায়। এর বিধান কী?

উত্তর: প্রশ্নের ধরণে বুঝা যায় এ নারী মাহরামের সাথে মক্কায় আগমণ করেছে। কিন্তু ঋতু অবস্থাতেই সে মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে। ঋতু অবস্থায় তার এ ইহরাম বিশুদ্ধ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে যুলহুলায়ফার মীকাতে আগমণ করলে আসমা বিনতে উমাইস রাদিয়াল্লাহু 'আনহা প্রশ্ন করেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঋতুবতী হয়ে গেছি। তিনি বললেন,

«اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي».

"গোসল করে তোমার লজ্জাস্থানে কাপড় বা নেকড়া বেঁধে দাও এবং ইহরাম বাঁধ।"[২১]

মক্কায় আসার পর পবিত্র হয়ে মাহরাম ছাড়া যদি উমরার কাজ সম্পাদন করে থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সে শহরের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু উমরা সম্পাদন করার পর সে যে আবার রক্ত দেখেছে তাতে তার পবিত্রতার ব্যাপারে একটি প্রশ্ন দাঁড় করায়। আমরা বলব, যদি সে নিশ্চিতভাবে পবিত্রতা দেখে থাকে তবে তার উমরা বিশুদ্ধ।

[21] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ।

কিন্তু এ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে সন্দেহের মধ্যে থাকলে নতুন করে উমরা করে নিবে। অবশ্য এর জন্য নতুন করে ইহরাম বাঁধার জন্য মীকাত যেতে হবে না। শুধুমাত্র তাওয়াফ, সা‘ঈ ও চুল খাট করার কাজগুলো নতুন করে সম্পাদন করবে।

তাওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে নারী ঋতুবতী হয়ে পড়লে কি করবে?

প্রশ্ন: (৪৮৪) জনৈক নারী তাওয়াফে ইফাদ্বা করে নি। ইতোমধ্যে সে ঋতুবতী হয়ে গেছে। তার ঠিকানা সঊদী আরবের বাইরে। হজ কাফেলাও চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে, তাই দেরী করা সম্ভব হবে না এবং পরবর্তীতে মক্কা ফিরে আসাটাও তার জন্য দুরূহ ব্যাপার। এখন সে কি করবে?

উত্তর: বিষয়টি যদি এরূপই হয় যেমন প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজের তাওয়াফ না করেই নারী ঋতুবতী হয়ে গেছে। পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করার জন্য মক্কায় থেকে যাওয়াটাও তার জন্য দুঃসাধ্য অথবা চলে গেলে আবার মক্কা ফেরত আসাটাও অসম্ভব, তবে এ অবস্থায় নিম্ন লিখিত দু'টি সমাধানের যে কোনো একটি সে গ্রহণ করতে পারে:

১। ঋতু বন্ধ করার জন্য ট্যাবলেট বা ইঞ্জেকশন ব্যবহার করবে- যদি তাতে ক্ষতির আশংকা না থাকে- তারপর তাওয়াফ করবে।
২। লজ্জাস্থানে প্যাড বা কাপড় বেঁধে দিবে যাতে করে মসজিদে রক্ত না পড়ে। তারপর তাওয়াফ করবে। এটাই বিশুদ্ধ মত, যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া রহ. পছন্দ করেছেন।
এর বিপরীত সমাধান হচ্ছে, নিম্নলিখিত দু'টির যে কোনো একটি:

১। ইহরামের অবশিষ্ট যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা থেকে বিরত থেকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকবে। অর্থাৎ স্বামী সহবাসে লিপ্ত হবে না। অবিবাহিতা হলে কোনো বিবাহের আকদ করবে না। তারপর পবিত্র হলে তাওয়াফ করবে।

২। অথবা নিজেকে হজের কর্মসমূহ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত মনে করবে এবং হালাল হওয়া যাবে এবং ফিদইয়াস্বরূপ একটি কুরবানী করবে। কিন্তু এ অবস্থায় তার এ হজ্জটি হজ হিসেবে গণ্য হবে না।

সন্দেহ নেই যে, উল্লিখিত এ দু'টি বিষয়ের উভয়টিই কঠিন। কারণ, ইহরাম অবস্থায় থেকে যাওয়াটা যেমন কঠিন ব্যাপার, তেমনি হজ বাতিল করে দেওয়াটা আরো কঠিন। এ কারণে জরুরী অবস্থা হিসেবে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া রহ.-এর মতটিই এখানে সঠিক। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ﴾ [الحج: ٧٨]

"আল্লাহ তোমাদের জন্য দীনের মাঝে কোনো অসুবিধা রাখেননি।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ৭৮]

তিনি আরো বলেন,

﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতা চান, তোমাদের জন্য কঠিন কিছু তিনি চান না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

কিন্তু এ নারীর জন্যে যদি সম্ভব হয় চলে গিয়ে পবিত্র হলে আবার ফেরত এসে হজের তাওয়াফ করা, তবে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ সময়ের মধ্যে স্বামী সহবাস জায়েয হবে না। কেননা তাওয়াফ না করলে হাজী সাহেব দ্বিতীয় হালাল বা পূর্ণ হালাল হয় না।

প্রশ্ন: (৪৮৫) ঋতু এসে যাওয়ার কারণে জনৈক নারী উমরা না করেই মক্কা থেকে ফেরত চলে গেছে। তার বিধান কী?

উত্তর: উমরার ইহরাম বাঁধার পর যদি নারীর ঋতু এসে যায়, তবে ইহরাম বাতিল হবে না। উমরার ইহরাম বাঁধার পর ঋতুর কারণে তাওয়াফ-সাঈ না করেই মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে, সে ইহরাম অবস্থাতেই রয়েছে। তার ওপর আবশ্যক হচ্ছে মক্কা প্রত্যাবর্তন করে তাওয়াফ, সা'ঈ ও চুল ছোট করে হালাল হওয়া। তার উপর আবশ্যক হচ্ছে ইহরাম অবস্থায় যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। চুল বা নখ কাটবে না, স্বামী থাকলে তার সাথে সহবাস করবে না।

তবে ইহরাম বাঁধার সময় যদি ঋতুর আশংকায় শর্ত আরোপ করে নেয় যে, যেখানেই বাধাগ্রস্ত হবে সেখানেই সে হালাল হয়ে যাবে। তবে ঋতু আসার পর ইহরাম খুলে ফেললে তাকে কোনো কাফফারা দিতে হবে না।

নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোনো পোষাক আছে?

প্রশ্ন: (৪৮৬) ইহরাম অবস্থায় নারী কি স্বীয় কাপড় বদল করতে পারবে? নারীর জন্য কি ইহরামের বিশেষ কোনো পোষাক আছে?

উত্তর: নারী যে কাপড়ে ইহরাম করেছে তা পরিবর্তন করে অন্য কাপড় পরিধান করতে পারে। পরিবর্তন করার দরকার থাক বা না থাক কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যে কাপড় পরবে তাতে যেন বেপর্দা হওয়ার আশংকা না থাকে বা পরপুরুষের সামনে নিজের সৌন্দর্যের প্রকাশ না ঘটে।

নারীর জন্য ইহরামের বিশেষ কোনো পোষাক নেই। তার ইচ্ছামত যে কোনো পোষাক পরিধান করতে পারে। তবে নেকাব পরবে না এবং হাতমোজা পরিধান করবে না। নেকাব হচ্ছে এমন পর্দা মুখমণ্ডলে ব্যবহার করা যাতে চোখের জন্য ছিদ্র করা থাকে।

আর পুরুষের ইহরামের জন্য বিশেষ পোষাক আছে। তা হচ্ছে একটি চাদর অন্যটি (সেলাইবিহীন) লুংঙ্গী। তাই সে জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি, পাগড়ী, টুপি, মোজা প্রভৃতি পরবে না।

প্রশ্ন: (৪৮৭) ইহরামকারী নারীর হাত মোজা এবং পা মোজা পরার বিধান কী?

উত্তর: হাতমোজা ব্যবহার করা জায়েয নেই। পায়ের মোজা ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই।

হাত মোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ».

“নারী হাত মোজা পরিধান করবে না।”[২২]

---

[22] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: শিকারের জরিমানা অনুচ্ছেদ: ইহরাম পরিধানকারী নারী-পুরষের জন্য সুগন্ধি ব্যবহার নিষেধ।

ঋতুবতী নারী বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করবে

প্রশ্ন: (৪৮৮) জনৈক নারী ঋতু অবস্থায় মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধেছে। মক্কায় আগমণ করে বিলম্ব করে পবিত্র হওয়ার পর উমরা আদায় করেছে। তার এ উমরার বিধান কী?

উত্তর: তার উমরা বিশুদ্ধ। যদিও একদিন বা দু'দিন বা ততোধিক দিন বিলম্ব করে থাকে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হচ্ছে ঋতু থেকে পূর্ণ পবিত্র হওয়ার পরই উমরা আদায় করবে। কেননা ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা জায়েয নয়। এজন্য আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা উমরার ইহরাম বেঁধে মক্কায় আগমণ করলে ঋতুবতী হয়ে পড়েন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন,

«افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي».

"হাজীগণ যা করে তুমিও তাই করে যাও, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করো না।"[২৩]

যখন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ঋতুবতী হয়ে গেলন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে কি আমাদেরকে আটকিয়ে রাখবে নাকি? তিনি ভেবেছিলেন সাফিয়্যাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা তাওয়াফে ইফাদ্বা করেন নি। তারা বলল, তিনি তো তাওয়াফে ইফাদ্বা করে

---

[23] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হায়েয, অনুচ্ছেদ: ঋতুবতী তওয়াফ ছাড়া হজের যাবতীয় কাজ করবে।

নিয়েছেন। একথা শুনে তিনি বললেন, ‘তাহলে তোমরা বের হয়ে পড়’।[২৪]

অতএব, ঋতুবতী নারীর জন্য আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করা বৈধ নয়। মক্কায় এসে ঋতুবতী হয়ে পড়লে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। কিন্তু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ শেষ করে সা‘ঈ করার পূর্বে যদি ঋতু এসে যায়, তবে উমরা পূর্ণ করবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই। আর সা‘ঈ শেষ করার পর ঋতু আসলে তখন বিদায়ী তাওয়াফের আবশ্যকতা নেই। কেননা ঋতুবতীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ রহিত।

---

[24] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজের তওয়াফের পর নারী ঋতুবতী হলে; সহীহ মুসলিম অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতী নারীর জন্য রহিত হওয়া।

ঋতুবতী নারী ইহরামের পর পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করতে পারে

প্রশ্ন: (৪৮৯) মীকাত থেকে ঋতুবতী অবস্থায় জনৈক নারী ইহরাম বাঁধে। মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র সে খুলে ফেলে। এর বিধান কী?

উত্তর: ঋতুবতী অবস্থায় নারী যদি মীকাত থেকে ইহরাম বাঁধে, তারপর মক্কায় এসে পবিত্র হওয়ার পর পরিধেয় ইহরাম বস্ত্র খুলে ফেলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ, কাপড় পরিবর্তন করে ইচ্ছামত যে কোনো বৈধ পোষাক পরিধান করা জায়েয। অনুরূপভাবে পুরুষও পরিধেয় ইহরামের কাপড় পরিবর্তন করে অনুরূপ ইহরামের কাপড় পরিধান করতে পারে। কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: (৪৯০) হজের সময় নিকাব দিয়ে নারীর মুখ ঢাকার বিধান কী? আমি একটি হাদীস পড়েছি যার অর্থ হচ্ছেঃ “ইহরামকারী নারী নেকাব পরবে না এবং হাত মোজা পরিধান করবে না।” আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার অন্য একটি কথা পড়েছি। তিনি বলেন, “আমাদের সামনে কোনো পুরুষ এলে আমরা মুখের উপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। যখন আমরা ওদের সামনে চলে যেতাম, তখন মুখমণ্ডল খুলে রাখতাম” সে সময় তারা হজে ছিলেন। দু’টি হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য কী?

উত্তর: এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হাদীসের মর্ম অনুযায়ী নারী ইহরাম অবস্থায় নেকাব পরবে না। পুরুষ তার সম্মুখে আসুক বা না আসুক কোনো অবস্থাতেই তার জন্য নেকাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। সে হজে থাক বা উমরায়। নেকাব নারী সমাজে সুপরিচিত। আর তা হচ্ছে একটি

পর্দা দিয়ে মুখন্ডল ঢেকে নেওয়া যাতে দু'চোখের জন্য আলাদা আলাদা দু'টি ছিদ্র থাকে। কিন্তু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহার হাদীস নেকাব নিষিদ্ধের হাদীসের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ নয়। কেননা আয়েশার হাদীসে একথা বলা হয় নি যে, তারা নেকাব পরতেন; বরং নেকাব না পরে মুখ ঢেকে ফেলতেন। আর পরপুরুষ সামনে এলে নারীদের মুখ ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। কেননা মাহরাম নয় এমন পুরুষের সামনে নারীর মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

অতএব, ইহরামের ক্ষেত্রে সবসময় নেকাব পরিধান করা হারাম। আর পরপুরুষ সামনে না এলে মুখমণ্ডল খোলা রাখা ওয়াজিব। কিন্তু সামনে এলে ঢেকে ফেলা ওয়াজিব। তবে নেকাব ছাড়া অন্য কাপড় ঝুলিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন: (৪৯১) ভুল ক্রমে অথবা অজ্ঞতাবশতঃ ইহরামের নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে ফেললে, তার বিধান কী?

উত্তর: ইহরামের কাপড় পরিধান করার পর অন্তরে দৃঢ় ইচ্ছা করে ইহরাম না বেঁধে থাকে আর নিষিদ্ধ কোনো কাজ করে তবে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করাটাই ধর্তব্য। ইহরামের কাপড় পরিধান করা মানেই ইহরাম বাঁধা নয়।

কিন্তু সঠিকভাবে নিয়ত করে ইহরামে প্রবেশ করার পর যদি ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কোনো নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলে, তবে কোনো কিছু

দিতে হবে না। তবে স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে বা শিখিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে অজ্ঞ ব্যক্তি উক্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত হবে।

উদাহরণ: ইহরাম করার পর ভুলক্রমে জামা পরে নিয়েছে, তার কোনো গুনাহ নেই। তবে মনে পড়ার সাথে সাথে তাকে উক্ত জামা খুলে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে ভুলক্রমে সে পায়জামা খুলে নি। নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করার পর মনে পড়েছে যে, পায়জামা তো খুলা হয় নি। তখন সাথে সাথে সে তা খুলে ফেলবে।

কোনো লোক সেলাই ছাড়া শুধু গিরা দিয়ে তৈরিকৃত একটি গেঞ্জি পরিধান করে যদি মনে করে যে, ইহরামকারীর জন্য শুধু সেলাইকৃত কাপড় পরা নিষেধ। তাই আমি এটা পরিধান করেছি, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা সে অজ্ঞ। কিন্তু যখন তাকে জানানো হবে যে, শরীরের মাপে তৈরিকৃত যাবতীয় পোষাক পরিধান করা নিষিদ্ধ তখন তা খুলে ফেলা তার জন্য আবশ্যক হবে।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যাবতীয় কাজ যদি কোনো মানুষ ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ বা বাধ্যগত অবস্থায় করে, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

“হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোনো কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

আল্লাহ বলেন, আমি তাই করলাম। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡ﴾ [الاحزاب: ٥]

"ভুলক্রমে তোমরা যা করে ফেল সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তর যার ইচ্ছা করে তার কথা ভিন্ন।" [সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৫]

ইহরাম অবস্থায় বিশেষভাবে নিষিদ্ধকৃত পশু শিকার করা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا﴾ [المائدة: ٩٥]

"যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে উহা (শিকার) হত্যা করে।" [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

ইহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। সকল ক্ষেত্রে বিধান একই। যেমন, পোষাক পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো প্রভৃতি অথবা শিকার হত্যা করা, চুল কেটে ফেলা প্রভৃতি। আলিমদের মধ্যে কেউ পার্থক্য করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা এ নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ভুল বা অজ্ঞতা বা বাধ্যগত কারণে মানুষ মা'যুর বা তার অপরাধ ক্ষমাযোগ্য।

হজে ভুল হলে তার ফিদইয়া কোথায় আদায় করতে হবে?

প্রশ্ন: (৪৯২) জনৈক ব্যক্তি হজ আদায় করার ক্ষেত্রে ভুলে লিপ্ত হয়েছে। ভুলের কাফফারা দেওয়ার জন্য তার কাছে তেমন কিছু ছিল না। সে দেশে ফেরত চলে গেছে। উক্ত কাফফারা কি নিজ দেশে আদায় করা জায়েয হবে? নাকি মক্কাতেই পাঠাতে হবে? যদি মক্কাতেই পাঠাতে হয়, তবে অন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর: হজ পালনকারী কি ভুল করেছেন তা নির্দিষ্টভাবে অবশ্যই জানতে হবে। যদি কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করে থাকে, তবে ফিদইয়া হিসেবে মক্কাতে একটি কুরবানী করতে হবে। মক্কা ছাড়া অন্য কোথাও প্রদান করলে জায়েয হবে না। কেননা তা হজের সাথে সম্পৃক্ত।

কিন্তু যদি ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কোনো কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করে থাকে, তবে নিম্নলিখিত তিনটি পদ্ধতির যে কোনো একটি অবলম্বন করতে পারেঃ

ক) একটি ছাগল যবেহ করে মক্কার হারাম এলাকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে। অথবা

খ) ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য দিবে। প্রত্যেককে অর্ধ ছা’ (প্রায় সোয়া কেজী) পরিমাণ খাদ্য দিবে। আর তা মক্কায় হতে হবে অথবা যে স্থানে ঐ নিষিদ্ধ কাজ করা হয়েছে সেখানে। অথবা

গ) তিন দিন সাওম রাখবে। এ তিনটি সাওম মক্কা বা যে কোনো স্থানে রাখতে পারে তবে নিষিদ্ধ কাজটি যদি হজের প্রথম হালালের আগে স্ত্রী

সহবাস হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার স্থানে অথবা মক্কায় একটি উট যবেহ করবে এবং ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে।

অথবা নিষিদ্ধ কাজটি যদি কোনো প্রাণী শিকার করা হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছেঃ তার অনুরূপ প্রাণী যবেহ করা অথবা ছয়জন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা বা তিনটি সিয়াম পালন করা। সিয়াম পালন যে কোনো স্থানে করা যায়। কিন্তু খাদ্য দান বা কুরবানী যবেহ করা অবশ্যই মক্কার হারাম এলাকার মধ্যে হতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেন, “হাদঈ কা‘বা ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিবে।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯৫]

অন্য মানুষকে দায়িত্ব দিয়ে উক্ত কাফফারা আদায় করা জায়েয আছে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অবশিষ্ট কুরবানীগুলো যবেহ করার জন্য আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন: (৪৯৩) তাওয়াফের পূর্বে সা‘ঈ করা কি জায়েয?

উত্তর: তাওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে সা‘ঈ করা জায়েয। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন একস্থানে দণ্ডায়মান হলেন, লোকেরা তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। কেউ প্রশ্ন করল, سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ ‘তাওয়াফ করার পূর্বে আমি সা‘ঈ করে নিয়েছি।’ তিনি

বললেন, لاحَرَجَ "কোন অসুবিধা নেই।[২৫] তামাত্তু'কারী যদি (মুযদালিফা থেকে ফিরে এসে) তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করে এবং ইফরাদকারী বা ক্বেরাণকারী তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ না করে থাকলে হজের তাওয়াফের পূর্বে যদি সা'ঈ করে, তবে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: (৪৯৪) রামাযানে বারবার উমরা করার বিধান কী? এরকম কোনো সময় কি নির্দিষ্ট আছে যে, এতদিন পরপর উমরা করতে হবে?

উত্তর: রামাযানে বারবার উমরা করা বিদ'আত। কেননা এক মাসের মধ্যে বারবার উমরা করা সালাফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরামের নীতির বিপরীত। এমনকি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া রহ. তাঁর ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন, সালাফে সালেহীনের ঐকমত্যে বারবার বেশি পরিমাণে উমরা করা মাকরূহ। বিশেষ করে যদি তা রামাযানে হয়। বিষয়টি যদি পছন্দনীয় হত, তবে সালাফে সালেহীন তো এব্যাপারে অধিক অগ্রগামী হতেন এবং বারবার উমরা করতেন। দেখুন না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। নেক কাজকে সর্বাধিক ভালোবাসতেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় উনিশ দিন সেখানে অবস্থান করেছেন সালাত আদায় করেছেন। কিন্তু কোনো উমরা আদায় করেন নি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা যখন উমরা করার ব্যাপারে পিড়াপিড়ী

---

[25] আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুচ্ছেদ: হজে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হাদীস নং ১৭২৩।

করছিলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ভ্রাতা আবদুর রহমানকে বললেন, একে তান‘ঈম নিয়ে গিয়ে ইহরাম করিয়ে নিয়ে আস। যাতে করে তিনি উমরা আদায় করতে পারেন। কিন্তু আবদুর রহমানকে একথা বললেন না, তুমিও তাঁর সাথে উমরা করে নিও। যদি বিষয়টি শরী‘আতসম্মত হতো তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে নির্দেশনা দিতেন। সাহাবায়ে কেরামের নিকট বিষয়টি শরী‘আতসম্মত হলে আবদুর রহমান তা করতেন। কেননা তিনি তো হারাম এলাকার বাইরে গিয়েছিলেন।

দু’ উমরার মাঝে কত ব্যবধান হওয়া উচিৎ এসম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, দেখবে যে পর্যন্ত মাথা পোড়া কাঠের মত কালো না হয়। অর্থাৎ মাথা ভর্তি চুল না হয়।

প্রশ্ন: (৪৯৫) তাওয়াফ চলাবস্থায় যদি সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে কি করবে? তাওয়াফ কি পুনরায় শুরু করবে? পুনরায় শুরু না করলে কোথা থেকে তাওয়াফ পূর্ণ করবে?

উত্তর: মানুষ যদি উমরা বা হজ বা বিদায়ী তাওয়াফ বা নফল তাওয়াফে লিপ্ত থাকে, আর ফরয সালাতের ইকামত হয়ে যায়, তবে তাওয়াফ ছেড়ে দিয়ে সালাতের কাতারে শামিল হয়ে যাবে। সালাত শেষ হলে যেখান থেকে তাওয়াফ ছেড়েছিল সেখান থেকে তাওয়াফ পূর্ণ করবে। নতুনভাবে তাওয়াফ শুরু করার দরকার নেই এবং ঐ চক্করও নতুনভাবে শুরু করবে না। কেননা সে তো শরী‘আতসম্মত বিশুদ্ধ ভিত্তির উপরই

বাকী কাজ আদায় করছে। সুতরাং শরী‘আতের দলীল ছাড়া তার আগের কাজকে বাতিল বলা যাবে না।

প্রশ্ন: (৪৯৬) উমরায় তাওয়াফের পূর্বে সা‘ঈ করার বিধান কী?

উত্তর: উমরাকারী তাওয়াফের পূর্বে যদি সা‘ঈ করার পর তাওয়াফ করে থাকে তবে তাকে পুনরায় সা‘ঈ করতে হবে। কেননা দু’টি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। প্রথমে তাওয়াফ তারপর সা‘ঈ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরকম সিরিয়াল রক্ষা করেই তা আদায় করেছেন। তিনি বলেন, “তোমরা আমার নিকট থেকে হজ-উমরার নিয়ম শিখে নাও।”[২৬] আমরা নবীজীর শিখানো পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাইলে প্রথমে আমাদেরকে তাওয়াফ শুরু করতে হবে। তারপর সা‘ঈ। কিন্তু যদি বলে যে, আমি প্রথমবার সা‘ঈ করাতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমরা তাকে বলব, তুমি কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে সা‘ঈ কর। কিন্তু ভুলের উপর অটল থাকা চলবে না।

তাবে‘ঈদের মধ্যে কেউ এবং কতিপয় বিদ্বান মত পোষণ করেন যে, ভুলক্রমে বা অজ্ঞতাবশতঃ কেউ যদি উমরাতে তাওয়াফের পূর্বে সা‘ঈ করে ফেলে, তবে তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না। যেমনটি হজের বেলায় হয়ে থাকে।

[26] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ: পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতওয়া দেওয়া; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

প্রশ্ন: (৪৯৭) ইদ্বতেবা‘ কাকে বলে? এ কাজ কোন সময় সুন্নাত?

উত্তর: ইদ্বতেবা‘ হচ্ছে গায়ের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে তার উভয় দিক বাম কাঁধের উপর রাখা এবং ডান কাঁধ খোলা রাখা।

তাওয়াফে কুদূম তথা মক্কায় আগমণের পর প্রথম তাওয়াফের সময় এ কাজ সুন্নাত। অন্য সময় ইদ্বতেবা‘ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন: (৪৯৮) নফল সা‘ঈ করা কি জায়েয আছে?

উত্তর: নফল সা‘ঈ করা জায়েয নয়। কেননা সা‘ঈ শুধুমাত্র হজ-উমরার সময় শরী‘আতসম্মত। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِۖ فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَاۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيۡرٗا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ١٥٨﴾ [البقرة: ١٥٨]

“নিশ্চয় ‘সাফা’ ও ‘মারওয়া’ আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। অতএব, যে ব্যক্তি এ গৃহের হজ বা উমরা করবে তার জন্য এতদুভয়ের প্রদক্ষিণ করা দূষণীয় নয়। আর কোনো ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎকর্ম করলে আল্লাহ গুণগ্রাহী সর্বজ্ঞাত।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫]

প্রশ্ন: (৪৯৯) অজ্ঞতাবশতঃ তাওয়াফে ইফাদ্বা ছেড়ে দিলে করণীয় কী?

উত্তর: তাওয়াফে ইফাদ্বা (হজের তাওয়াফ) হজের অন্যতম রুকন। ইহা আদায় না করলে হজ সম্পন্ন হবে না। কোনো মানুষ তা ছেড়ে দিলে তার হজ পূর্ণ হলো না। তা অবশ্যই আদায় করতে হবে- যদিও এজন্য তাকে নিজ দেশ থেকে ফিরে আসতে হয়। এ অবস্থায় যেহেতু সে

হজের তাওয়াফ করে নি, তাই তার জন্য স্ত্রী সহবাস বৈধ নয়। কেননা সে এখনো পূর্ণ হালাল হয় নি। তাওয়াফে ইফাদ্বার সাথে যদি সা'ঈও ছেড়ে থাকে, তবে তামাত্তু'কারীকে তাওয়াফে ইফাদ্বা এবং সা'ঈ করতে হবে এবং ক্বিরান ও ইফরাদকারী তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ না করে থাকলে, তাদেরকেও তাওয়াফে ইফাদ্বার সাথে সা'ঈ করতে হবে, তবেই তারা পূর্ণ হালাল হবে এবং হজ বিশুদ্ধ হবে।

তাওয়াফের সময় হজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা আবশ্যক নয়

প্রশ্ন: (৫০০) অনেক তাওয়াফকারীকে দেখা যায় ভীড়ের মধ্যে ঠেলে ঠেলে তাদের নারীদেরকে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার জন্য পাঠায়। তাদের জন্য কোনটি উত্তম হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা? নাকি পুরুষদের ভীড় থেকে দূরে অবস্থান করা।

উত্তর: প্রশ্নকারী যখন এ আশ্চর্য বিষয় দেখেছে, আমি এর চাইতে অধিক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখেছি। আমি দেখেছি কিছু লোক ফরয নামাযান্তে এক দিকে সালাম ফেরানো হলে দ্বিতীয় সালাম ফেরানোর পূর্বে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার জন্য দৌড় দেয়। এতে তো তার ফরয সালাতই বাতিল হয়ে গেল। যে সালাত কিনা ইসলামের অন্যতম প্রধান রুকন। অথচ সে এমন একটি কাজ করতে ছুটেছে যা ওয়াজিব নয়। এমনকি তাওয়াফ অবস্থায় না থাকলে হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরী'আতসম্মতও নয়। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরাট ধরণের দুঃখজনক অজ্ঞতা। তাওয়াফ ছাড়া হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা সুন্নাত নয়। এব্যাপারে আমার কোনো দলীল জানা নেই। আমি এ স্থান থেকে আহ্বান জানাচ্ছি যে, আমার জ্ঞানের বাইরে যদি কারো কাছে এমন কোনো দীলল জানা থাকে যে, তাওয়াফ না করলেও হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করা শরী'আতসম্মত, তবে সে যেন আমাদের কাছে তা পৌঁছিয়ে দেয়। আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিবেন।

অতএব, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করা তাওয়াফের সুন্নাতের অন্তর্গত। তাছাড়া এটা তখনই সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হবে যখন তা চুম্বন করতে

গিয়ে তাওয়াফকারী কষ্ট পাবে না বা অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া হবে না। যদি তাওয়াফকারীর কষ্ট হয় বা অন্য কাউকে কষ্ট দেওয়া হয়, তবে দ্বিতীয় পদক্ষেপ অবলম্বন করবে এবং তা হাত দ্বারা স্পর্শ করে হাতকে চুম্বন করবে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যদি একাজও কষ্ট করা ও কষ্ট দেওয়া ছাড়া আদায় করা সম্ভব না হয়, তবে আমরা তৃতীয় স্তরে উপনীত হয়ে দূর থেকে হাজরে আসওয়াদকে এক হাত দ্বারা ইশারা করব। কিন্তু সে হাতকে চুম্বন করব না। এটাই হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন করার সুন্নাতী পদ্ধতি।

হাজরে আসওয়াদকে চুম্বনের বিষয়টি আরো জটিল ও কঠিন হবে- যেমনটি প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছেন- নারীদেরকে পাথর চুম্বন করার জন্য ঠেলে দেওয়া, হতে পারে সে নারী গর্ভবতী বা বৃদ্ধা বা দুর্বল যুবতী অথবা শিশুকে উপরে উঠিয়ে চুম্বনের জন্য এগিয়ে দেওয়া, তবে এসব কাজ গর্হিত ও নাজায়েয। কেননা এতে দুর্বল লোকদেরকে ভয়ঙ্কর এক অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যেখানে আছে সংকীর্ণতা ও পুরুষদের ভীড়ের প্রচণ্ডতা। তাই বিষয়টি মাকরূহ অথবা হারামের অন্তর্গত। আল্লাহর রহমতে অন্য ব্যবস্থা থাকতে কোনো মানুষের পক্ষে এদিকে অগ্রসর হওয়া উচিৎ নয়। আপনি যদি কঠিনভাবে ইসলামের বিধান পালন করতে চান, তবে পরাজিত হবেন।

পূর্ণ সাত চক্কর তাওয়াফ না করলে উমরা হবে না

প্রশ্ন: (৫০১) জনৈক নারী স্বামীর সাথে তামাত্তু‘ হজ করতে এসেছে। তারা উমরার তাওয়াফ করার সময় ৬ষ্ঠ চক্করে স্বামী বললেন, এটাই সপ্তম চক্কর এবং তিনি নিজ মতের উপর অটল ছিলেন। এখন স্ত্রীর করণীয় কী?

উত্তর: উক্ত নারী যদি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে সে ৬ চক্কর দিয়েছে এবং তাওয়াফ পূর্ণ করে নি। তবে এখন পর্যন্ত তার উক্ত উমরা পূর্ণ হয় নি। কেননা উমরার অন্যতম রুকন হচ্ছে পূর্ণ সাত চক্কর তাওয়াফ করা। এরপর যদি হজের ইহরাম করে থাকে, তখন সে ক্বিরানকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা উমরা শেষ করার আগেই সে উমরাকে হজের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়েছে।

কিন্তু স্বামীর অটলতা দেখে যদি স্ত্রী সন্দেহের মধ্যে পড়ে যায়, তবে কোনো অসুবিধা নেই। তখন তার উমরা পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা তার সন্দেহ, আর স্বামীর নিশ্চয়তা এ অবস্থায় স্বামীর কথায় ফিরে আসবে এবং সেটাকেই প্রাধান্য দিবে।

হজ-উমরায় নিজের ভাষায় দো‘আ করাই উত্তম

প্রশ্ন: (৫০২) উমরা বা হজকারী যদি দো‘আ না জানে, তবে তাওয়াফ, সা‘ঈ প্রভৃতির সময় কি কোনো বই হাতে নিয়ে দেখে দেখে দো‘আ পাঠ করা জায়েয হবে?

উত্তর: হজ বা উমরাকারী যে সমস্ত দো‘আ জানে এগুলোই তার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সাধারণতঃ সে যা জানে তা সে বুঝে। আর বুঝে-শুনেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ। কিন্তু যদি কোনো বই হাতে নিয়ে দো‘আ পড়ে বা কাউকে ভাড়া নিয়ে তার শিখিয়ে দেওয়া দো‘আ পড়ে- যার কিছুই সে বুঝে না, তবে তাতে কোনই উপকার হবে না। তাছাড়া বাজারের এ বইগুলোতে তাওয়াফ-সাঈর জন্য যে দো‘আ নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তা বিদ‘আত এবং বিভ্রান্তি। কোনো মুসলিমের জন্য এগুলো পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা ও বিশেষ কোনো দো‘আ শিক্ষা দেন নি। সাহাবায়ে কেরাম থেকেও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

“আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।”[২৭]

তাই সকল মুমিনের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে এ ধরণের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক থাকা। আর নিজের দরকারের কথা আল্লাহর কাছে এমন ভাষায় পেশ করা যার অর্থ সে নিজে অনুধাবন করে। সাধ্যানুযায়ী আল্লাহর যিকির করা। অর্থ বুঝে না এমন শব্দ ব্যবহার করার চাইতে এটাই তার জন্য উত্তম। অনেকে এমনও আছে যে অর্থ বুঝা তো দূরের কথা বইয়ের শব্দ বা বাক্যগুলোই ভালোভাবে পড়তে পারে না।

প্রশ্ন: (৫০৩) তাওয়াফ-সা‘ঈতে কি বিশেষ কোনো দো‘আ আছে?

উত্তর: হজ-উমরার জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো‘আ নেই। মানুষ জানা যে কোনো দো‘আ পাঠ করতে পারবে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দো‘আসমূহ পাঠ করা উত্তম। বিশেষ করে রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এ দো‘আ পাঠ করা সুন্নাত: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ “রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ্, ওয়াক্বিনা আযাবান্নার।” অনুরূপভাবে সাফা-মারওয়ায় ও ‘আরাফার দিবসের প্রমাণিত দো‘আ পাঠ করতে পারে। সুন্নাত থেকে প্রমাণিত যে সমস্ত দো‘আ জানা আছে তাই পাঠ করা উচিৎ। কিন্তু জানা না থাকলে

---

[27] আবু দাউদ, অধ্যায়: মানসেক, অনুচ্ছেদ: রমল করা; তিরমিযী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কীভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

তার মাথায় যে দো‘আই আসে তাই পাঠ করা যাবে। কেননা এ দো‘আ পাঠ করা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তা মুস্তাহাব।

এ উপলক্ষে আমি বলতে চাই, হজ-উমরার জন্য ছোট ছোট পুস্তিকা হাজীদের হাতে দেখা যায়। তাতে তাওয়াফ-সাঈর প্রত্যেক চক্করের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দো‘আ নির্দিষ্ট করা থাকে। এটা বিদ‘আত। এতে নিশ্চিতভাবে অনেক ধরণের বিপদ আছে। যেমন,

১) যারা এটা পাঠ করে, তারা ধারণা করে যে, বইয়ের দো‘আগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। অথচ তা সাব্যস্ত নয়।

২) তারা এ দো‘আর প্রত্যেকটি শব্দ পাঠ করা ইবাদত মনে করে।

৩) কোনো মর্ম বা অর্থ না বুঝেই তা পাঠ করে।

৪) প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা আলাদা দো‘আ নির্দিষ্ট করে।

৫) ভীড়ের কারণে চক্কর পূর্ণ হওয়ার আগেই দো‘আ পড়া শেষ হয়ে গেলে চুপ করে থাকে।

৬) আর দো‘আ শেষ হওয়ার আগে চক্কর শেষ হয়ে গেলে দো‘আ পড়া ছেড়ে দেয়। এ বিদ‘আতী আমলের কারণে এতগুলো ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

অনুরূপভাবে মাক্বামে ইবরাহীমের কাছে পাঠ করার জন্য ঐ বইয়ে যে দো‘আ পাওয়া যায়, তাও বিদ‘আত। কেননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। বরং তিনি সেখানে গিয়ে পাঠ করেছেন, ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبۡرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] "তোমরা মাক্বামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান হিসেবে গ্রহণ কর।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৫] এবং তিনি এর পিছনে দু'রাকাত সালাত আদায় করেছেন। অতএব, যারা এখানে এসে অতিরিক্ত দো'আ পাঠ করে এবং অন্যান্য মুসল্লী ও তাওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, তাদের এ কাজ দু'টি কারণে গর্হিত ও বিদ'আত:

(ক) এ সমস্ত দো'আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত না হওয়ার কারণে তা বিদ'আত।

(খ) যারা মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে সালাত আদায় করে তাদের সালাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন: (৫০৪) উমরা শেষ করার পর ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পেলে কি করবে?

উত্তর: কোনো মানুষ উমরার তাওয়াফ ও সা'ঈ শেষ করার পর যদি ইহরামের কাপড়ে নাপাকী দেখতে পায়, তবে তার তাওয়াফ বিশুদ্ধ, সা'ঈ বিশুদ্ধ তথা উমরা বিশুদ্ধ। কেননা কারো কাপড়ে যদি তার অজানাতে কোনো নাপাকী লেগে থাকে অথবা জানে কিন্তু তা পরিস্কার করতে ভুলে যায় এবং সেই কাপড়ে সালাত আদায় করে, তবে তার

সালাত বিশুদ্ধ। অনুরূপভাবে ঐ কাপড়ে যদি তাওয়াফ করে তবে তাওয়াফও বিশুদ্ধ। একথার দলীল আল্লাহর বাণী:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]

"হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোনো কিছু করে ফেলি, তবে আমাদের পাকড়াও করবেন না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬]

এটি একটি সাধারণ দলীল। যা ইসলামের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। এখানে একটি বিশেষ দলীল আছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে জুতা পরিহিত অবস্থায় সালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ তিনি জুতা খুলে ফেললেন। লোকেরাও জুতা খুলে ফেললেন। সালাত শেষ করে তিনি তাদেরকে বললেন, "তোমাদের কি হয়েছে? কেন তোমরা জুতা খুলে ফেললে? তারা বললেন, আপনি জুতা খুলে ফেলেছেন, আপনার দেখাদেখি আমরাও জুতা খুলে ফেললাম। তিনি বললেন, "জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমার জুতায় নাপাকী আছে। তাই আমি ইহা খুলে ফেলেছি।"[২৮] কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নতুন করে আর সালাত আদায় করলেন না। অথচ তাঁর সালাতের প্রথম দিকের কিছু অংশ নাপাকী নিয়েই হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা জানতেন না। অতএব, ভুলক্রমে অথবা না জানার কারণে কেউ যদি কাপড়ে

---

[28] আবু দাউদ, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: জুতা পরে সালাত আদায় করা।

নাপাকী নিয়ে সালাত আদায় করে বা তাওয়াফ করে তবে তা বিশুদ্ধ হবে।

একটি মাসআলা: কোনো মানুষ যদি ছাগলের মাংস মনে করে উটের মাংস খায় এবং এ ভিত্তিতে অযু না করেই সালাত আদায় করে। যখন বিষয়টি সে জানবে তখন তাকে কি সালাত পুনরায় পড়তে হবে? হ্যাঁ, অযু করে তাকে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

কেউ যদি প্রশ্ন করে, এটা কেমন কথা? অজ্ঞতাবশতঃ নাপাকী নিয়ে সালাত আদায় করলে তা দোহরাতে হবে না; কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ উটের মাংস খেয়ে অযু না করে সালাত আদায় করলে তা দোহরাতে হবে?

এর জবাব: একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি (theory) হচ্ছে, (নির্দেশমূলক বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয় না। কিন্তু নিষিদ্ধ বিষয় অজ্ঞতা ও ভুলের কারণে রহিত হয়ে যায়।) এ মূলনীতির দলীল হচ্ছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: তিনি বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে বা ভুলে যায়, তবে স্মরণ হলেই সে যেন তা আদায় করে নেয়।"[২৯] কোনো এক সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলক্রমে দু'রাকাত সালাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিলেন, বিষয়টি তাঁকে স্মরণ করানো হলো, তিনি তখন শুধুমাত্র ছুটে যাওয়া দু'রাকাতই আদায় করলেন। এথেকে বুঝা যায় নির্দেশিত বিষয় ভুলে যাওয়ার কারণে রহিত হয় না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

[29] দেখুন ১৮৫ নং প্রশ্নের উত্তর।

আদেশ করেছেন সালাত ভুলে গেলে স্মরণ হলেই আদায় করে নিতে হবে। তা ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে অজ্ঞতার কারণে নির্দেশমূলক রহিত হয় না তার দলীল হচ্ছে, জনৈক ব্যক্তি এসে খুব তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করলো, তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সালাম দিলো, তিনি তাকে বললেন, ফিরে যাও আবার সালাত আদায় করো, কেননা তুমি সালাতই আদায় করো নি। এভাবে তিন বার তাকে ফেরালেন। প্রতিবারই সে সালাত আদায় করে তাঁর কাছে আসলে তিনি তাকে বললেন, "ফিরে গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাতই আদায় করো নি।"[৩০] শেষ পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সালাত শিখিয়ে দিলেন, ফলে সে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে সালাত আদায় করল। এ লোকটি সালাতের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব 'ধীরস্থিরতা' অজ্ঞতার কারণে পরিত্যাগ করেছিল। সে বলেছিল, 'শপথ সেই সত্বার যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, আমি এর চাইতে সুন্দর ভাবে সালাত আদায় করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।' অজ্ঞতার কারণে যদি ওয়াজিব রহিত হয়ে যেত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওযর গ্রহণ করতেন এবং বারংবার তাকে সালাত পড়তে বলতেন না।

[30] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: আযান, অনুচ্ছেদ: কিরাত পাঠ করা ওয়াজিব; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: সালাত, অনুচ্ছেদ: প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন: (৫০৫) মাক্বামে ইবরাহীমে যে পদচিহ্ন দেখা যায়, তা কি প্রকৃতই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পায়ের চিহ্ন?

উত্তর: সন্দেহ নেই মাক্বামে ইবরাহীম সুপ্রমাণিত। কাঁচে ঘেরা স্থানটিই মাক্বামে ইবরাহীম। কিন্তু এর মধ্যে যে গর্ত দেখা যায় তাতে পায়ের কোনো চিহ্ন প্রকাশিত নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, বহুকাল পর্যন্ত পাথরের উপর দু'পায়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বর্তমানের এ গর্তটি শুধুমাত্র পরিচয়ের জন্য করা হয়েছে। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না যে, এ গর্তই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদদ্বয়ের চিহ্ন।

এ উপলক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অনেক উমরাকারী ও হজ পালনকারী মাক্বামে ইবরাহীমের পাশে এসে এমন কিছু দো'আ পাঠ করে যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। কখনো এরা উঁচু কণ্ঠে দো'আ পাঠ করে এবং মুসল্লী বা তাওয়াফকারীদের মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মাক্বামে ইবরাহীমের জন্য নির্দিষ্ট কোনো দো'আ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই। মানুষ যা পাঠ করে তা মৌলবীদের তৈরিকৃত। সুন্নাত হচ্ছে তাওয়াফ শেষ করে (মাক্বামে ইবরাহীমের) পিছনে এসে হালকা করে দু'রাকাত সালাত আদায় করা। (বেশি ভীড় থাকলে সেখানে সালাত না পড়ে আরো পিছনে বা যে কোনো স্থানে সালাত পড়া যাবে।) তারপর সালাত হয়ে গেলেই সেখানে বসে থাকবে না; যারা সালাত পড়তে চায় তাদের জন্য জায়গা খালি করে দিবে।

প্রশ্ন: (৫০৬) কা‘বা শরীফের গিলাফ ধরে দো‘আ বা কান্নাকাটি করা জায়েয কী?

উত্তর: কা‘বা শরীফের গিলাফ ধরে বরকত কামনা করা বা দো‘আ বা কান্নাকাটি করা বিদ‘আত। কেননা এ কাজ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নেই। মুআবিয়া ইবন আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাওয়াফ করার সময় যখন কা‘বা ঘরের প্রতিটি কোণ স্পর্শ করছিলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা প্রতিবাদ করেছেন। মুআবিয়া বললেন, ‘কা‘বা ঘরের কোনো অংশই ছাড়ার নয়।’ তখন ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জবাবে বললেন, “নিশ্চয় আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমি দেখেছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মাত্র দু’টি কর্ণার স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী। অতএব, আমাদের ওপর আবশ্যক হচ্ছে কা‘বা ঘরকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দলীলেরই অনুসরণ করব। কেননা এতেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শকে আঁকড়ে থাকতে পারব।

অবশ্য মুলতাযিম অর্থাৎ কা‘বা ঘরের দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থান স্পর্শ করে দো‘আ করা, সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম থেকে প্রমাণিত হয়েছে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন: (৫০৭) উমরায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করার বিধান কী? এ দু’টির মধ্যে কোনটি উত্তম?

উত্তর: উমরায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করা ওয়াজিব। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজে মক্কায় আগমণ করে তাওয়াফ ও সা'ঈ করার পর যারা কুরবানী সাথে নিয়ে আসেনি তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তারা যেন মাথার চুল ছোট করে হালাল হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আদেশ ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে। অতএব, চুল ছোট করা আবশ্যক। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৬ষ্ঠ হিজরীতে উমরা করার জন্য গমণ করলে হুদায়বিয়া নামক স্থানে কাফিরদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন, তখন তিনি সাহাবীগণকে সেখানেই মাথা মুণ্ডন করার নির্দেশ প্রদান করেন। তারা নির্দেশ পালনে দ্বিধায় ভোগলে তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হন। আর মাথার চুল ছোট করার চাইতে মাথা মুণ্ডন করা উত্তম।[৩১] তবে তামাত্তু'কারী যদি শেষ সময়ে মক্কায় পৌঁছে, তবে উমরা করার পর চুল ছোট করাই ভালো, যাতে করে হজের সময় মুণ্ডন করার জন্য মাথায় চুল পাওয়া যায়।

[31] কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দো'আ করেছেন এবং চুল ছোটকারীদের জন্য একবার দো'আ করেছেন; সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, হাদীস নং ১৬১৩; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, হাদীস নং ২২৯৫।

তামাত্তু‘ হজ সম্পর্কিত একটি মাসআলা

প্রশ্ন: (৫০৮) জনৈক হাজী তামাত্তু‘ হজ করতে এসে, উমরার তাওয়াফ ও সা‘ঈ শেষ করে ইহরাম খুলে সাধারণ পোশাক পরিধান করে নিয়েছে। মাথা মুণ্ডন করে নি বা চুল ছোট করে নি। হজের যাবতীয় কাজ শেষ করার পর এ সম্পর্কে সে জানতে চেয়েছে। এখন তার করণীয় কী?

উত্তর: এ ব্যক্তি উমরার একটি ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেছে। তা হচ্ছে, চুল খাটো করা বা মাথা মুণ্ডন করা। বিদ্বানদের মতে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে ফিদইয়া হিসেবে একটি কুরবানী করা। তা মক্কাতেই আদায় করতে হবে এবং সেখানকার ফকীরদের নিকট তার গোশত বিতরণ করতে হবে। তবেই তার তামাত্তু‘ হজ সম্পাদন হবে এবং উমরা বিশুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন: (৫০৯) যে ব্যক্তি তামাত্তু‘ হজের ইহরাম বেঁধে উমরা শেষ করে চুল কাটেনি বা মুণ্ডনও করে নি। পরে হজের সমস্ত কাজ শেষ করেছে তাকে কি করতে হবে?

উত্তর: এ ব্যক্তি উমরায় চুল ছোট করা পরিত্যাগ করেছে। আর চুল ছোট করা উমরার একটি ওয়াজিব কাজ। বিদ্বানদের মতে ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে দম তথা কুরবানী ওয়াজিব হবে। তা মক্কায় যবেহ করে সেখানকার ফকীরদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আর এর মাধ্যমে হজ ও উমরা পূর্ণতা লাভ করবে। মক্কার বাইরে অবস্থান করলে যে কোনো লোককে উক্ত ফিদইয়া মক্কায় আদায় করার জন্য দায়িত্ব দিতে পারে। (আল্লাহ তাওফীক দাতা)

প্রশ্ন: (৫১০) তামাত্তু‘কারী কুরবানী দিতে পারে নি। হজে সে তিনটি সাওম রেখেছে। কিন্তু হজ থেকে ফিরে এসে সাতটি সাওম রাখেনি। এভাবে তিন বছর কেটে গেছে। তার করণীয় কী?

উত্তর: তার উপর আবশ্যক হচ্ছে দশ দিনের মধ্যে থেকে অবশিষ্ট সাত দিনের সিয়াম এখনই পালন করে নেয়া। (আল্লাহ্‌র কাছে তার জন্য সাহায্য চাই)

প্রশ্ন: (৫১১) উমরা করে জনৈক লোক নিজ দেশে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করেছে। তার উমরার বিধান কী?

উত্তর: বিদ্বানগণ বলেন, মাথা মুণ্ডন করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই। মক্কা বা মক্কা ছাড়া অন্য কোনো স্থানে মুণ্ডন করলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মাথা মুণ্ডন করার উপর ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়া নির্ভর করছে। তাছাড়া মুণ্ডন করার পর বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। উমরার কাজগুলোর ধারাবাহিকতা এ রকম: ইহরাম, তাওয়াফ, সা‘ঈ, মাথা মুণ্ডন বা ছোট করা এবং উমরার কাজ শেষ করার পর মক্কায় অবস্থান করলে বিদায়ী তাওয়াফ করা। কিন্তু উমরার কাজ শেষ করে মক্কায় অবস্থান না করলে বিদায়ী তাওয়াফের দরকার নেই। অতএব, মক্কায় অবস্থান করতে চাইলে উমরার কাজ শেষ করে মক্কাতেই তাকে মাথা মুণ্ডন বা চুল ছোট করতে হবে। কারণ, তাকে এরপর বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। কিন্তু তাওয়াফ-সাঈ শেষ করার সাথে সাথেই যদি মক্কা থেকে বের হয়ে থাকে, তবে নিজ দেশে বা শহরে গিয়ে মাথা

মুণ্ডন বা চুল খাটো করতে পারে। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত তাকে ইহরাম অবস্থাতেই থাকতে হবে।

প্রশ্ন: (৫১২) তামাত্তু‘ হজের ইহরাম বেঁধে উমরা করে কোনো কারণবশতঃ হজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। তাকে কি কোনো কাফফারা দিতে হবে?

উত্তর: তাকে কোনো কাফফারা দিতে হবে না। কেননা তামাত্তু‘কারী উমরার ইহরাম বাঁধার পর উমরা পূর্ণ করে যদি হজের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা দু’টি কাজ আলাদা আলাদা ইহরামে সম্পাদন করতে হয়। হ্যাঁ, সে যদি মানত করে থাকে যে এ বছরই হজ করবে তবে মানত পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন: (৫১৩) তামাত্তু‘ হজের ইহরাম বাঁধার পর উমরা শেষ করে অজ্ঞতাবশতঃ হালাল হয় নি। এভাবে **হজের কাজ শেষ করে কুরবানী করেছে। তার করণীয় কী? তার হজ কি বিশুদ্ধ?**

উত্তর: জানা আবশ্যক যে, কোনো মানুষ তামাত্তু‘ হজের ইহরাম বাঁধলে তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে, তাওয়াফ, সা‘ঈ শেষ করে মাথার চুল খাটো করে হালাল হয়ে যাওয়া। কিন্তু উমরার তাওয়াফ শুরু করার পূর্বে যদি হজের নিয়ত করে ফেলে এবং ইহরাম খোলার ইচ্ছা না করে, তবে কোনো অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় তার হজ ক্বিরান হজে পরিণত হবে। তার হাদঈও হবে ক্বিরান হজের হাদঈ।

কিন্তু যদি উমরার নিয়তেই থাকে এমনকি তাওয়াফ-সাঈ শেষ করে ফেলে, তবে অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, তার হজের ইহরাম বিশুদ্ধ নয়। কেননা উমরার তাওয়াফ শুরু করার পর উমরাকে হজে প্রবেশ করানো বিশুদ্ধ নয়।

বিদ্বানদের মধ্যে অন্যদের মত হচ্ছে, এতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা সে ছিল অজ্ঞ। আমি মনে করি তাকে কোনো কিছু দিতে হবে না। তার হজ বিশুদ্ধ ইনশাআল্লাহ্। (আল্লাহই তাওফীক দাতা)।

প্রশ্ন: (৫১৪) আরাফাত থেকে ফেরার পথে একদল লোক মুযদালিফার রাস্তা হারিয়ে ফেলে। রাত একটার দিকে তারা মাগরিব ও এশা সালাত আদায় করে। মুযদালিফা পৌঁছার সময় ফজরের আযান হয়ে যায়। সেখানে তারা ফজর সালাত আদায় করে। এখন তাদেরকে কি কোনো জরিমানা দিতে হবে?

উত্তর: এদেরকে কোনো ফিদইয়া বা জরিমানা দিতে হবেনা। কেননা তারা ফজরের আযানের সময় মুযদালিফায় প্রবেশ করেছে এবং সেখানে অন্ধকার থাকতেই ফজর সালাত আদায় করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। তিনি বলেন,

«مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ».

“যে ব্যক্তি আমাদের সাথে এ সালাতে উপস্থিত হয়েছে এবং প্রস্থান করা পর্যন্ত আমাদের সাথে অবস্থান করেছে। আর এর পূর্বে আরাফাতে রাতে

বা দিনে অবস্থান করেছে, সে তার হজ পূর্ণ করে নিয়েছে এবং তার অবিন্যস্ত অবস্থা দূর করে নিয়েছে।”[৩২]

কিন্তু এরা মধ্যরাত্রির পর মাগরিব-এশা সালাত আদায় করে ভুল করেছে। কেননা এশা সালাতের শেষ সময় মধ্যরাত্রি। যেমনটি সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবন আমর ইবন ‘আছ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত আছে।

---

[32] তিরমিযী, অধ্যায়: হজ, হাদীস নং ৮১৫।

সামর্থ্য থাকা সত্বেও অন্যকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করা

প্রশ্ন: (৫১৫) জনৈক নারী মুযদালিফা থেকে শেষ রাত্রে যাত্রা করেছে এবং সামর্থ্য থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে তার পক্ষ থেকে কঙ্কর নিক্ষেপের দায়িত্ব প্রদান করেছে। এর বিধান কী?

উত্তর: হজের কার্যাদির মধ্যে অন্যতম কাজ হচ্ছে কঙ্কর নিক্ষেপ করা। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাজের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিজে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি বলেন,

«إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ».

“আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা‘ঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করা।”[৩৩] এটি একটি ইবাদত। মানুষ এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য কামনা করবে। তাঁর যিকিরকে প্রতিষ্ঠিত করবে। যেহেতু এটার ভিত্তি শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতের ওপর, তাই উচিৎ হচ্ছে, কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহর জন্য ভীত হবে ও বিনয়াবনত হবে। তবে প্রথম সময়েই তাড়াহুড়া করে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে যাবে না; বরং দেরী করে শেষ সময়ে নিক্ষেপ করবে। অবস্থাভেদে সিদ্ধান্ত নিবে। শেষ সময়ে যদি প্রশান্তি, ধীরস্থিরতা, বিনয় ও অন্তরের উপস্থিতির সাথে নিক্ষেপ করা যায়, তবে দেরী করাই উত্তম। কেননা এটা এমন বৈশিষ্ট্য যা ইবাদতের বিশুদ্ধতার সাথে

[33] আবু দাউদ, অধ্যায়: মানাসেক, অনুচ্ছেদ: রমল করা; তিরমিযী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কীভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

সংশ্লিষ্ট। আর যে বৈশিষ্ট্য ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট তা ইবাদতের সময় ও স্থানের ওপর অগ্রগণ্য। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ».

“খাদ্য উপস্থিত হলে এবং দু’টি নাপাক বস্তুর (পেশাব-পায়খানার) চাপ থাকলে সালাত নেই।”[৩৪] অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং মনের চাহিদা পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ সালাতকে প্রথম সময় থেকে বিলম্ব করে আদায় করবে। অতএব, কঙ্কর মারার জন্য প্রথম সময়ে যদি ভীড়ের কারণে বেশি কষ্ট হয়, কঙ্কর মারার চাইতে নিজের জান বাঁচানোর দায় বেশি হয়, আর বিলম্বে কঙ্কর মারলে যদি প্রশান্তির সাথে অন্তর উপস্থিত রাখা যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে এ ইবাদত করা যায়, তবে বিলম্বে কঙ্কর মারাই উত্তম। এজন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারের দুর্বল লোকদেরকে শেষ রাতেই মুযদালিফা ছেড়ে চলে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। যাতে করে তারা ভীড়ের মধ্যে পড়ে কষ্ট না পায়।

অতএব, একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, নারী হোক বা পুরুষ হোক সামর্থ্যবান হলে কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দেওয়া জায়েয নয়। নিজেই কঙ্কর মারার ইবাদতটি পালন করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ

---

[34] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: মসজিদ ও সালাতের স্থান, অনুচ্ছেদ: খাদ্যের উপস্থিতিতে সালাত পড়া মাকরূহ।

বলেন, “তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর।” এতে নারী-পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। তবে কোনো পুরুষ বা নারী অসুস্থ হয় বা নারী গর্ভবতী হয় এবং ভীড়ের মধ্যে গেলে গর্ভের ক্ষতি হওয়ার আশংকা করে, তবে তারা যে কাউকে কঙ্কর মারার দায়িত্ব দিতে পারে।

প্রশ্নে উল্লিখিত যে নারী সামর্থ্য থাকা সত্বেও নিজের ছেলেকে দিয়ে কঙ্কর মারিয়েছে- আমি মনে করি ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে সতর্কতাবশতঃ সে একটি দম (কুরবানীযোগ্য প্রাণী) প্রদান করবে এবং তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বন্টন করে দিবে।

কঙ্কর যদি হাওয বা গর্তের মধ্যে না পড়ে

প্রশ্ন: (৫১৬) জনৈক হাজী পূর্ব দিক থেকে জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মেরেছে। কিন্তু তা হাওয বা গর্তের মধ্যে পড়ে নি। ঘটনাটি ছিল ১৩ তারিখে। তাকে কি তিনটি জামরাতেই পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?

উত্তর: সবগুলো স্থানে তাকে পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে না; বরং যে ক্ষেত্রে ভুল করেছে সেটাই শুধু পুনরায় মারবে। অতএব, শুধুমাত্র জামরা আক্বাবায় পুনরায় কঙ্কর মারবে। সঠিক পদ্ধতিতে মারবে। পূর্ব দিক থেকে মারলে যদি হাওযে কঙ্কর না পড়ে তবে মারা জায়েয হবে না। কেননা কঙ্কর মারার স্থানই হচ্ছে হাওয। এ কারণে যদি ব্রীজের উপরে গিয়ে পূর্ব দিক থেকে কঙ্কর মারে এবং তা হাওযে পড়ে তবে তা জায়েয হবে।

সাতটি কঙ্করের মধ্যে দু'একটি কঙ্কর হাওযে না পড়লে

প্রশ্ন: (৫১৭) সাতটি কঙ্করের মধ্যে থেকে যদি একটি বা দু'টি কঙ্কর জামরায় না পড়ে এবং এ ভাবে এক বা দু'দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে কি তাকে সবগুলো জামরায় পুনরায় কঙ্কর মারতে হবে?

উত্তর: যদি কারো কোনো জামরায় একটি বা দু'টি পাথর নিক্ষেপ বাকী থাকে, তবে ফিক্বাহবিদগণ বলেন, যদি এটা শেষ জামরায় হয়ে থাকে, তবে শুধু বাকীটা মেরে দিলেই হয়ে যাবে, পূর্বেরগুলো আর মারতে হবেনা। কিন্তু যদি প্রথম বা মধ্যবর্তী জামরার কোনো একটিতে এক বা একাধিক পাথর মারা বাকী থাকে, তবে সেটা পূর্ণ করবে এবং

তারপরের জামরাগুলোতে পাথর মারবে। কেননা পাথর মারার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব।

আমার মতে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাকী পাথরটাই মারবে। তারপরের জামরাতে আর পাথর মারতে হবে না। কেননা ভুল বা অজ্ঞতার কারণে ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে। এ লোক যখন মধ্যবর্তী জামরাতে পাথর মেরেছে, তার তো এ ধারণা নেই যে, এর পূর্বে কোনো পাথর মারা তার বাকী আছে। সুতরাং বিষয়টি সে ভুলে গেছে অথবা তাতে সে অজ্ঞ। তাই তাকে আমরা বলব, যে ক'টা পাথর মারা বাকী রয়েছে তা মেরে দিন। এরপর আর কোনা পাথর মারতে হবে না।

এ জবাব শেষ করার আগে আমি সতর্ক করতে চাই যে, জামরা হচ্ছে পাথর একত্রিত হওয়ার স্থান বা পাথরের হাওয। যে লম্বা স্তম্ভ দেখা যায় সেটাই জামরা নয়। এটা শুধু চিহ্নের জন্য রাখা হয়েছে। অতএব, যদি হাওযে বা গর্তের মধ্যে কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং ঐ স্তম্ভে না লাগে তাতে কোনো অসুবিধা নেই তার নিক্ষেপ বিশুদ্ধ। (আল্লাহ্ অধিক জানেন)

যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে

প্রশ্ন: (৫১৮) কেউ কেউ বলেন, যে কঙ্কর একবার নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা নাকি আবার নিক্ষেপ করা যাবে না। এ কথাটি কি ঠিক? এর কোনো দলীল আছে কী?

উত্তর: একথা সঠিক নয়। কেননা যারা নিক্ষিপ্ত কঙ্কর পুনরায় নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেন তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ

1) নিক্ষিপ্ত কঙ্কর (মায়ে মুস্তা'মাল) তথা ব্যবহৃত পানির মত। আর ফরয পবিত্রতায় যদি কোনো পানি ব্যবহার করা হয়, তবে সে ব্যবহৃত পানিটা পবিত্র থাকলেও সে পানি অন্যকে পবিত্র করতে পারে না।
2) বিষয়টি ক্রীতদাসের মত। কাফফারা প্রভৃতিতে যদি তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়, তবে তো তাকে আবার মুক্ত করা যাবে না।
3) এর দ্বারা এটা আবশ্যক হয়ে পড়ে যে, সকল হাজীর জন্য একটি মাত্র পাথর মারাই জায়েয হবে। অর্থাৎ আপনি পাথরটি মারবেন, তারপর আবার সেটা নিবেন এবং মারবেন, তারপর আবার নিবেন এবং মারবেন এভাবে সাতবার পূর্ণ করবেন। তারপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে সেই পাথরটি সাতবার নিয়ে সাতবার মারবে।

   বস্তুত: গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এ তিনটি যুক্তি খুবই দুর্বল:

১) ব্যবহৃত পানির যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়। কেননা কোনো ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য পানি ব্যবহার করা হলে পানি নিজে পবিত্র থাকবে কিন্তু অন্যকে পবিত্র করতে পারবে না

এটি দলীল বিহীন একটি কথা। বস্তুত পানির যে প্রকৃত গুণ রয়েছে অর্থাৎ পবিত্রতা, তা দলীল ছাড়া রহিত করা যাবে না। অতএব, ওয়াজিব পবিত্রতা অর্জনের জন্য ব্যবহৃত পানি নিজে পবিত্র, আর তা অন্যকেও পবিত্র করতে পারে। এর মাধ্যমে প্রথম যুক্তির খণ্ডন হয়ে গেল এবং কঙ্কর মারাকে তার সাথে তুলনা করা ভুল প্রমাণিত হল।

২) নিক্ষিপ্ত কঙ্করকে মুক্ত ক্রীতদাসের সাথে তুলনা করাও ঠিক নয়। কেননা উভয়ের মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। ক্রীতদাসকে মুক্ত করা হলে সে তো স্বাধীন হয়ে গেল। তাকে আবার মুক্ত করার সুযোগ থাকলো না। কিন্তু কঙ্কর মারা হয়ে গেলেও সেটা কঙ্করই রয়ে যায়। যে কারণে তা নিক্ষেপ করা হয়েছিল সে কারণ তাতে অবশিষ্ট রয়েছে। এ কারণে ক্রীতদাস আবার যদি কখনো শর'ঈ দলীলের ভিত্তিতে দাসে পরিণত হয়, তবে পুনরায় তাকে মুক্ত করা যাবে।

৩) তৃতীয় যুক্তির জবাবে আমরা বলব: সমস্ত হাজীকে একটি মাত্র পাথর নিক্ষেপ আবশ্যক করা- যদি সম্ভব হয় তো হোক। কিন্তু তা অসম্ভব। অসংখ্য পাথর থাকতে কোনো বুদ্ধিমান ঐ চিন্তা করতে পারে না।

সুতরাং কঙ্কর মারতে গিয়ে যদি আপনার হাত থেকে দু'একটি কঙ্কর পড়ে যায় তবে সম্মুখ থেকে সহজলভ্য কঙ্কর কুড়িয়ে নিয়ে তা মেরে দিন- চাই তা একবার মারা হয়েছে বা হয় নি তা দেখার বিষয় নয় এবং

তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

প্রশ্ন: (৫১৯) তাওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে হজের সা'ঈ করা কি জায়েয?

উত্তর: হাজী সাহেব যদি ইফরাদ বা ক্বিরানকারী হয়, তবে তার জন্য তাওয়াফে ইফাদ্বার পূর্বে হজের সা'ঈ করা জায়েয আছে। তাওয়াফে কুদুমের পর পরই তা আদায় করে নিবে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যে যারা হাদঈ সাথে নিয়ে এসেছিলেন তারা করেছিলেন।

কিন্তু তামাত্তু'কারী হলে তাকে দু'বার সা'ঈ করতে হবে। প্রথমবার মক্কায় আগমণ করে উমরার জন্য। প্রথমে তাওয়াফ করবে, তারপর সা'ঈ করে চুল খাট করে হালাল হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়বার সা'ঈ করবে ('আরাফাত দিবসের পর) হজের জন্য। উত্তম হচ্ছে তাওয়াফে ইফাদ্বা আদায় করার পর এ সা'ঈ করা। কেননা সা'ঈ তাওয়াফের পরের কাজ। অবশ্য যদি সেদিন তাওয়াফের পূর্বে কেউ সা'ঈ করে ফেলে তবে বিশুদ্ধ মতে কোনো অসুবিধা হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেদিন (১০ তারিখ) জিজ্ঞেস করা হয়েছে: আমি তো তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করে ফেলেছি। জবাবে তিনি বলেছেন, “কোনো অসুবিধা নেই।”[৩৫]

---

[35] আবু দাউদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুচ্ছেদ: হজ্জে একটি কাজের পূর্বে অন্যটি করে ফেলার বিধান। হাদীস নং ১৭২৩।

হাজী সাহেব ঈদের দিন তথা দশই জিলহজ পাঁচটি কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করবে:

১) জামরা আক্বাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা

২) তারপর হাদঈ যবাই করা

৩) তারপর মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করা

৪) অতঃপর কা'বা ঘরের তাওয়াফ করা

৫) সবশেষে ছাফা-মারওয়া সা'ঈ করা।

অবশ্য ইফরাদকারী ও ক্বেরাণকারী যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ করে নিয়ে থাকে, তবে পুনরায় তাকে সা'ঈ করতে হবে না। উত্তম হচ্ছে উল্লিখিত কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। কিন্তু যদি আগ-পিছ হয়ে যায় বা করে ফেলে- বিশেষ করে প্রয়োজন দেখা দিলে তবে কোনো অসুবিধা নেই। এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহর করুণার একটি বড় প্রমাণ।[৩৬]

প্রশ্ন: (৫২০) কখন জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারলে আদায় হবে? এবং কখন মারলে কাযা মারা হবে?

উত্তর: ঈদের দিন সর্বসাধারণের জন্য কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে, সূর্য

---

[36] দেখা যায় আমাদের দেশ থেকে অনেক হাজী তামাত্তু হজ করতে এসে ৮ই জিলহজে হজের ইহরাম বেঁধে বা নফল তাওয়াফ করে মীনা যাওয়ার পূর্বেই অগ্রীম সাফা-মারওয়া সাঈ করে নেয়। কিন্তু এটা বিশুদ্ধ নয়। এতে তাদের হজ হবে না। কেননা তারা সময়ের আগেই সে কর্মটি সম্পন্ন করেছে। - অনুবাদক ও সম্পাদক।

উঠার পর থেকে শুরু হবে। আর দুর্বলদের জন্য এ সময় শুরু হবে শেষ রাত থেকে। কঙ্কর মারার শেষ সময় হচ্ছে পরবর্তী দিন ১১ তারিখ ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি উক্ত সময়ের মধ্যে মারা সম্ভব না হয়, তবে আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে (১১, ১২ ও ১৩ তারিখ) যে সময় কঙ্কর মারা শুরু হবে সে সময়ই বিগত দিনের জামরা আক্বাবার কাযা পাথর নিক্ষেপ করবে। অর্থাৎ পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলার পর থেকে পাথর মারা শুরু হবে। আর শেষ হবে পরবর্তী দিন ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। কিন্তু আইয়্যামে তাশরীকের শেষ দিন (১৩ তারিখ) হলে রাত্রে কঙ্কর মারা যাবে না। কেননা সেদিন সূর্য অস্ত হলেই আইয়ামে তাশরীক শেষ হয়ে গেল এবং ১৪ তারিখ শুরু হয়ে গেল। সর্বাবস্থায় দিনের বেলায় কঙ্কর নিক্ষেপ করাই উত্তম। কিন্তু এ সময়ে হাজীদের ভীড়ের প্রচণ্ডতার কারণে, হাজীদের একে অপরের প্রতি বেপরওয়া হওয়ার কারণে যদি জানের ক্ষতির আশংকা করে বা কঠিন কষ্টকর হয়ে উঠে, তবে রাত্রে মারলে কোনো অসুবিধা হবে না। অবশ্য কোনো আশংকা না থাকলেও রাতে মারলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এ মাসআলায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ এবং একান্ত অসুবিধা না থাকলে রাতে কঙ্কর না মারা উচিৎ।

প্রশ্ন: (৫২১) বিশেষ করে ঈদের দিনের তাওয়াফের পূর্বে সা'ঈ করা কি জায়েয?

উত্তর: সঠিক কথা হচ্ছে, (মুযদালিফার পরে) ঈদের দিন বা অন্য দিনে কোনো পার্থক্য নেই। সর্বাবস্থায় (মুযদালিফার পরে) তাওয়াফের পূর্বে

সা‘ঈ করা জায়েয আছে। এমনকি ঈদের দিনের পরও যদি হয়। কেননা হাদীসের সাধারণ অর্থ একথাই প্রমাণ করে। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, তাওয়াফের পূর্বে আমি সা‘ঈ করেছি। তিনি বললেন, “কোনো অসুবিধা নেই।”

তাওয়াফের পর কি সরাসরি সা'ঈ করতে হবে? নাকি বিলম্ব করা যাবে?

প্রশ্ন: (৫২২) সা'ঈ আবশ্যক ছিল কিন্তু তাওয়াফ করার পর সরাসরি সা'ঈ না করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। পরে তাকে বিষয়টি জানানো হলো, সে কি এখন শুধু সা'ঈ করবে? নাকি পুনরায় তাওয়াফ করার পর সরাসরি সা'ঈ করবে?

উত্তর: কোনো মানুষ যদি তাওয়াফ করে এ বিশ্বাসে যে তাকে সা'ঈ করতে হবে না। কিন্তু পরে তাকে জানানো হলো যে, তাকে অবশ্যই সা'ঈ করতে হবে। তখন সে শুধুমাত্র সা'ঈ করলেই হয়ে যাবে। পুনরায় তাওয়াফ করার দরকার নেই। কেননা তাওয়াফের পর পরই সা'ঈ করতে এরকম কোনো শর্ত নেই।

এমনকি কোনো মানুষ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সা'ঈ করতে বিলম্ব করে- তবুও কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু উত্তম হচ্ছে তাওয়াফ শেষ করার পর পরই বিলম্ব না করে সা'ঈ করে নেয়া।

প্রশ্ন: (৫২৩) উমরায় যে ব্যক্তি মাথার এদিক ওদিক থেকে অল্প করে চুল কাটে, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

উত্তর: আমি মনে করি এ লোকের চুল খাটো করা সম্পন্ন হয় নি। তার ওপর ওয়াজিব হচ্ছে ইহরামের কাপড় পুনরায় পরিধান করে বিশুদ্ধভাবে মাথার সম্পূর্ণ অংশ থেকে চুল খাটো করা তারপর হালাল হওয়া।

এ উপলক্ষে আমি সতর্ক করতে চাই, কোনো কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতে চাইলে সে সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ

এবং তাঁর রাসূলের সীমারেখা জানা আবশ্যক। যাতে করে জেনে-শুনে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে। ইবাদতটি যেন অজ্ঞতার সাথে না হয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন,

﴿قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨]

"আপনি বলুন! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর দিকে আহ্বান করি জাগ্রত জ্ঞান সহকারে।" [সূরা ইউসুফ, আয়াত ১০৮]

কোনো মানুষ যদি মক্কা থেকে মদীনা সফর করতে চায়, তবে রাস্তা সম্পর্কে অবশ্যই নির্দেশনা নিতে হবে। মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যাতে করে পথভ্রষ্ঠ হয়ে গন্তব্য হারিয়ে না যায়। বাইরের পথের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে আভ্যন্তরীণ পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে সে সম্পর্কে কি জ্ঞানার্জন করতে হবে না? সে সম্পর্কে কি নির্ভরযোগ্য আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে না?

মাথার চুল খাটো করার অর্থ হচ্ছে মাথার সমস্ত অংশ থেকে চুলের কিছু কিছু অংশ কেটে ফেলা। চুল খাটো করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মেশিন ব্যবহার করা। কারণ, এতে সমস্ত মাথা থেকেই চুল কাটা হয়। অবশ্য কেঁচি দ্বারা চুল কাটাতেও কোনো অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে মাথার চতুর্দিক থেকে চুল কাটতে হবে। যেমন, করে মাথা মুণ্ডন করলে সমস্ত মাথা মুণ্ডন করতে হয়। যেমন অযুর সময় সমস্ত মাথাকে মাসেহ করতে হয়। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

প্রশ্ন: (৫২৪) কঙ্কর মারার সময় কী?

উত্তর: জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারার সময় হচ্ছে ঈদের দিন। সামর্থ্যবান লোকদের জন্য এ সময় শুরু হবে ঈদের দিন সূর্যোদয়ের পর থেকে। আর মানুষের ভীড় সহ্য করতে পারবে না এরকম দুর্বল, নারী, শিশু, প্রভৃতির জন্য সময় হচ্ছে ঈদের দিন শেষ রাত থেকে। আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ঈদের রাতে চাঁদ অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করতেন। চাঁদ অস্ত গেলেই মুযদালিফা ছেড়ে মিনা রওয়ানা হতেন এবং জামরা আক্বাবায় কঙ্কর মারতেন। আর এর শেষ সময় হচ্ছে ঈদের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কিন্তু যদি ভীড় প্রচণ্ড থাকার কারণে বা জামরা থেকে দূরে অবস্থানের কারণে রাতে কঙ্কর মারে তবে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু পরবর্তী দিন ১১ তারিখের ফজর বা সুবহে সাদেক পর্যন্ত যেন বিলম্ব না করে।

আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে পাথর নিক্ষেপের সময় শুরু হবে মধ্য দিনে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পর থেকে তথা যোহরের সময় থেকে এবং তা চলতে থাকবে রাত পর্যন্ত। আর কষ্ট ও ভীড়ের কারণে বিলম্ব করে ফজর উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তা নিক্ষেপ করা যাবে। এ তিন দিন যোহরের সময়ের পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ জায়েয হবে না। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করেন নি। আর লোকদের বলেছেন, "তোমরা আমার

নিকট থেকে হজ-উমরার বিধি-বিধান শিখে নাও।”[৩৭] সকালের দিকে ঠাণ্ডা এবং সহজ থাকা সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্ব করে কঠিন গরমে দুপুরের সময় কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন- এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, এ সময়ের পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হবে না।

এ কথার পক্ষে আরো প্রমাণ হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার সাথে সাথে যোহরের সালাত আদায় না করে প্রথমে কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে নিক্ষেপ করা জায়েয হতো, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পূর্বেই কঙ্কর মেরে প্রথম ওয়াক্তে যোহরের সালাত আদায় করতেন। কেননা প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা উত্তম। মোটকথা, আইয়ামে তাশরীকের দিনগুলোতে সূর্য ঢলার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করা জায়েয নয়।

প্রশ্ন: (৫২৫) জনৈক হাজী আরাফাতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় মীনায় রাত কাটায় নি, কঙ্কর নিক্ষেপ করে নি এবং তাওয়াফে ইফাদ্বাও করে নি। তাকে এখন কি করতে হবে?

উত্তর: আরাফাতের ময়দানে যে লোকটি অসুস্থ হয়েছে, তার অসুখ যদি এমন পর্যায়ের হয় যে, হজের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করা তার জন্য অসম্ভব, আর ইহরামের পূর্বে সে শর্ত করেছে (‘যদি আমি বাধাগ্রস্ত হই

[37] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ: পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতওয়া দেওয়া; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

তবে যেখানে বাধাগ্রস্ত সেখানেই হালাল হয়ে যাব’ এরূপ কথা বলেছে।) তবে সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু এটা ফরয হজ হলে পরবর্তী বছর পুনরায় তা আদায় করতে হবে। আর ইহরাম বাঁধার সময় যদি শর্ত না করে থাকে এবং হজের কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হয়, তবে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী সে ইহরাম খুলে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে হাদঈ যবেহ করতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“তোমরা আল্লাহর জন্য হজ-উমরা পূর্ণ কর। যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজ সাধ্য কুরবানী করবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

এখানে বাধাগ্রস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা অন্য যে কোনো কারণে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আর বাধাগ্রস্ত হওয়া মানে, কোনো কারণবশতঃ হজ-উমরার কাজ পূর্ণ করতে সক্ষম না হওয়া।

এ ভিত্তিতে সে হালাল হয়ে যাবে এবং হাদঈ যবেহ করবে। এছাড়া তার উপর অন্য কিছু আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি ফরয হজ আদায় না করে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে।

আর এ অসুস্থ ব্যক্তি যদি হজের কাজ চালিয়ে যায়। আরাফাত থেকে ফিরে এসে মুযদালিফায় রাত কাটায় কিন্তু মিনায় রাত কাটাতে সক্ষম না হয় এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করতে না পারে, তবে প্রত্যেকটি ওয়াজিবের জন্য একটি করে দম (কুরবানী বিশুদ্ধ হয় এমন প্রাণী) প্রদান করবে।

দু'টি দম প্রদান করতে হবে। একটি দম মিনায় রাত না কাটানোর জন্য, অন্যটি জামরাসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপ না করার জন্য।

কিন্তু সুস্থ হলে তাওয়াফে ইফাদ্বা আদায় করবে। কেননা বিশুদ্ধ মতানুযায়ী তাওয়াফে ইফাদ্বা জিল হজের শেষ পর্যন্ত করা যাবে। কিন্তু বাধা যদি আরো বড় হয় তবে, বাধা দূর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে তারপর তাওয়াফ করবে।

প্রশ্ন: (৫২৬) মুযদালিফার সীমা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বাইরে অবস্থান করলে করণীয় কী?

উত্তর: বিদ্বানদের মতে তাকে ফিদইয়াস্বরূপ একটি দম দিতে হবে অর্থাৎ একটি কুরবানী শুদ্ধ হওয়ার মত প্রাণী যবেহ করতে হবে এবং তা মক্কার ফক্বীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে। কেননা সে হজের একটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে।

এ উপলক্ষে আমি সম্মানিত হাজী ভাইদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, হজে এসে আরাফাত ও মুযদালিফার সীমানা সম্পর্কে আপনারা সতর্ক থাকবেন। দেখা যায়, অনেক হাজী আরাফাতের সীমানার বাইরে অবস্থান করেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তারপর আরাফাতের সীমানার মধ্যে প্রবেশ না করে সেখান থেকেই ফিরে আসেন। এদের হজ বিশুদ্ধ হবে না। তারা হজ না করেই ফিরে এলেন। এজন্য এ বিষয়ে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। আলহামদু লিল্লাহ এ সীমানা জানার জন্য 'আরাফাত ময়দানের চতুর্পার্শ্বে বিশাল বিশাল

বোর্ডের ব্যবস্থা আছে। তার প্রতি খেয়াল করলেই কোনো সমস্যা থাকবে না।

প্রশ্ন: (৫২৭) ইফরাদ হজকারী যদি তাওয়াফে কুদূমের সাথে সা'ঈ করে নেয়, তবে তাওয়াফে ইফাদ্বার পর তাকে কি আবার সা'ঈ করতে হবে?

উত্তর: তাওয়াফে ইফাদ্বার পর তাকে আর সা'ঈ করতে হবে না। কেননা তার উমরা নেই। সুতরাং তাওয়াফে কুদূমের সাথে সে যদি সা'ঈ করে থাকে, তবে এটাই হজের সা'ঈ হিসেবে গণ্য হবে। পরে আর সা'ঈ করতে হবে না।

প্রশ্ন: (৫২৮) ক্বিরানকারীর জন্য একটি তাওয়াফ ও একটি সা'ঈ যথেষ্ট হবে?

উত্তর: কোনো মানুষ যদি ক্বিরান হজ করতে চায়, তবে তার তাওয়াফে ইফাদ্বা বা হজের তাওয়াফ ও হজের সা'ঈ উমরা ও হজ উভয়টির জন্য যথেষ্ট হবে। তখন তাওয়াফে কুদূম তার জন্য সুন্নাত। সে ইচ্ছা করলে হজের সা'ঈ তাওয়াফে কুদূমের পরপরই আদায় করে নিতে পারে। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। ইচ্ছা করলে সা'ঈ বাকী রেখে তাওয়াফে ইফাদ্বার পর করতে পারে। কিন্তু পূর্বেই করে নেওয়া উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করেছিলেন। অতঃপর ঈদের দিন শুধুমাত্র তাওয়াফে ইফাদ্বা করবে। সা'ঈ করবে না। ক্বিরানকারীর হজ ও উমরার জন্য একটি মাত্র তাওয়াফ ও সা'ঈ যথেষ্ট হওয়ার দলীল হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহাকে বলেন,

«طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجَّتِكِ وَعُمْرَتِكِ»

"আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সা'ঈ তোমার হজ ও উমরার জন্য যথেষ্ট হবে।"[৩৮] আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা ছিলেন ক্বিরান হজকারীনী। অতএব, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিলেন যে, ক্বিরানকারীর তাওয়াফ ও সা'ঈ হজ ও উমরা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন: (৫২৯) জনৈক ব্যক্তি রাত বরোটা পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করে মক্কা চলে গেছে, ফজরের পূর্বে আর মিনায় ফেরত আসেনি। তার বিধান কী?

উত্তর: রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি হয়, তবে তারপর মিনা থেকে বের হলে কোনো অসুবিধা নেই। যদিও উত্তম হচ্ছে রাত ও দিনের পূর্ণ অংশ মিনাতেই অবস্থান করা। আর রাত বারোটা যদি মধ্য রাত্রি না হয় তবে বের হওয়া জায়েয হবে না। কেননা মিনায় অবস্থান করার শর্ত হচ্ছে রাতের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হওয়া। যেমনটি ফিক্বাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন: (৫৩০) ১২ তারিখে সূর্যাস্তের পূর্বে মিনা ত্যাগ করার পর কাজ থাকার কারণে কেউ যদি সূর্যাস্তের পর আবার মিনায় ফিরে আসে। এখন কি মিনায় রাত থাকা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যাবে?

---

[38] আবু দাঊদ, অধ্যায়: হজ-উমরা, অনুচ্ছেদ: ক্বিরাণকারীর তওয়াফ। এ হাদীসটির মূল সহীহ মুসলিমে রয়েছে।

উত্তর: না, মিনায় রাত থাকা তার উপর আবশ্যক হবে না। সে তাড়াহুড়াকারী হিসেবে গণ্য হবে। কেননা সে হজের যাবতীয় কার্যাদী সম্পন্ন করে ফেলেছে। কাজের জন্য মিনায় ফিরে আসা তাড়াহুড়ার পরিপন্থী নয়। কেননা তার মিনায় ফিরে আসার নিয়ত নির্দিষ্ট কাজের জন্য, হজের জন্য নয়।

১৩ জিলহজ সকালে কঙ্কর মারা জায়েয আছে কী?

প্রশ্ন: (৫৩১) সঊদী আরবের বাইরে অবস্থান করে এমন জনৈক হাজী হজের কাজ সম্পাদন করেছে। জিলহজের ১৩ তারিখে আছর তথা বিকাল চারটার সময় তার সফরের সময় নির্দিষ্ট। কিন্তু ১২ তারিখ কঙ্কর মারার পর সে মিনা থেকে বের হয় নি। ১৩ তারিখের রাত সেখানেই অবস্থান করেছে। এখন ১৩ তারিখ সকালে কঙ্কর মেরে মিনা থেকে বের হওয়া তার জন্য জায়েয হবে কী? উল্লেখ্য যে, যোহরের পর কঙ্কর মেরে বের হলে নির্ঘাত তার সফর বাতিল হয়ে যাবে, ফলে সে বিরাট অসুবিধায় পড়বে।

এর উত্তর যদি না জায়েয হয়, তবে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার ব্যাপারে কি কোনো মত পাওয়া যায় না?

উত্তর: কোনো অবস্থাতেই যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয নয়। জরূরী অবস্থা হিসেবে কঙ্কর নিক্ষেপ করা রহিত হবে না। তবে তার সমাধান হচ্ছে এ অবস্থায় কঙ্কর না মেরেই সে চলে যাবে এবং তার ফিদিয়া প্রদান করবে। আর তা হচ্ছে মক্কা বা মিনায় একটি দম প্রদান করবে অথবা কাউকে এর দায়িত্ব প্রদান করবে এবং উক্ত দম (কুরবানী শুদ্ধ হয় এমন প্রাণী) এর গোস্ত সেখানকার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দিবে। এরপর বিদায়ী তাওয়াফ করে মক্কা ত্যাগ করবে।

হ্যাঁ, যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারার বৈধতার ব্যাপারে মত পাওয়া যায়, কিন্তু তা বিশুদ্ধ নয়। সঠিক কথা হচ্ছে, ঈদের পর আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে কোনো অবস্থাতেই যোহরের সময়ের পূর্বে

কঙ্কর মারা জায়েয নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা আমার নিকট থেকে ইবাদতের (হজ-উমরার) নিয়ম শিখে নাও।”[৩৯] আর তিনি এ দিনগুলোতে যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারেন নি।

কেউ যদি বলে যে, যোহরের পর নবীজির কঙ্কর নিক্ষেপ তার সাধারণ একটি কর্ম। আর সাধারণ কর্ম দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।

জবাবে আমরা বলব, একথা সত্য যে এটি তাঁর সাধারণ কর্ম। তিনি যোহরের পর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছেন। এরকম বাচনিক নির্দেশ প্রদান করেন নি যে, ‘কঙ্কর নিক্ষেপ যোহরের পরেই হতে হবে’। তাছাড়া এ সময়ের পূর্বে নিক্ষেপের ব্যাপারে কোনো নিষেধও করেন নি। আর তাঁর কর্ম ওয়াজিবের অর্থ বহণ করে না। নির্দেশ সূচক শব্দ ছাড়া কোনো কাজ বাস্তবায়ন করা ওয়াজিব হয় না বা নিষেধ সূচক শব্দ ছাড়া পরিত্যাগ করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয় না। কিন্তু আমি বলব, নবীজির উক্ত কর্ম যে ওয়াজিব তার পক্ষে কারণ আছে। আর তা হচ্ছে, কঙ্কর মারার ব্যাপারে যোহরের সময় পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করাটাই প্রমাণ করে যে এটা ওয়াজিব। কেননা যোহরের পূর্বে কঙ্কর মারা যদি জায়েয হত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটাই করতেন। কারণ, উম্মতের জন্য এটাই

[39] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: ইলম বা জ্ঞান, অনুচ্ছেদ: পশুর পিঠে থাকাবস্থায় মানুষকে ফাতওয়া দেওয়া; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: কুরবানীর পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করেছে।

সহজ। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন দু'টি বিষয়ের মাঝে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখন তিনি উভয়টির মধ্য থেকে সহজটি গ্রহণ করতেন- যদি তাতে কোনো পাপ না থাকত। সুতরাং এখানে যখন তিনি সহজ অবস্থাটি গ্রহণ করেন নি অর্থাৎ যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন নি, তখন বুঝা যায় এতে পাপ আছে। অতএব, যোহরের সময় হওয়ার পরই কঙ্কর মারা ওয়াজিব।

এ কাজটি ওয়াজিব হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলার সাথে সাথে যোহরের সালাত আদায় করার পূর্বেই কঙ্কর মেরেছেন। যেন তিনি অধির আগ্রহে সূর্য ঢলার অপেক্ষা করছিলেন। যাতে করে দ্রুত কঙ্কর মারতে পারেন। আর একারণেই যোহর সালাত দেরী করে আদায় করেছেন। অথচ প্রথম সময়ে অর্থাৎ সময় হওয়ার সাথে সাথেই সালাত আদায় করা উত্তম। এথেকেই বুঝা যায় যে, যোহরের সময় হওয়ার পূর্বে কঙ্কর মারা জায়েয হবে না।

১২ তারিখে কঙ্কর না মারলে এবং বিদায়ী তাওয়াফ না করলে

প্রশ্ন: (৫৩২) জনৈক ব্যক্তি ১২ তারিখে কঙ্কর না মেরেই মিনা ছেড়েছে এ ধারণায় যে, এটাই অনুমোদিত তাড়াহুড়া এবং বিদায়ী তাওয়াফও করে নি। তার হজের কি হবে?

উত্তর: তার হজ বিশুদ্ধ। কেননা সে হজের কোনো রুকন পরিত্যাগ করে নি। কিন্তু সে তিনটি ওয়াজিব পরিত্যাগ করেছে- যদি ১২ তারিখের রাত মিনায় না কাটিয়ে থাকে।

প্রথম ওয়াজিব, ১২ তারিখের রাত মিনায় কাটানো।

দ্বিতীয় ওয়াজিব, ১২ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

তৃতীয় ওয়াজিব, বিদায়ী তাওয়াফ।

তার উপর আবশ্যক হচ্ছে প্রতিটি ছেড়ে দেওয়া ওয়াজিবের বিনিময়ে একটি করে দম দেওয়া। অর্থাৎ মোট তিনটি দম প্রদান করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করে দেওয়া। কেননা বিদ্বানদের মতে কেউ যদি হজের কোনো ওয়াজিব পরিত্যাগ করে, তবে তার বিনিময়ে দম প্রদান করে তা মক্কার ফকীরদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।

এ উপলক্ষে আমি হাজী সাহেবানদের সতর্ক করতে চাই, প্রশ্নকারী যে রকম ভুল করেছে অধিকাংশ হাজী এরকমই বুঝে থাকে এবং অনুরূপ ভুল করে থাকে। আল্লাহর বাণী: “যে ব্যক্তি দু’দিন থেকে তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোনো গুনাহ নেই।” তারা মনে করে এখানে

দু'দিন বলতে ঈদের দিন ও ১১তম দিনকে বুঝানো হয়েছে। তাই তারা ১১ তারিখে কঙ্কর মেরেই মিনা ত্যাগ করে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ নয়। এটা একটা মারাত্মক ভুল। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ﴾ [البقرة: ٢٠٣]

"তোমরা নির্দিষ্ট কতিপয় দিনে আল্লাহর যিকির কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দু'দিন থাকার পর তাড়াহুড়া করে চলে যেতে চায়, তার কোনো গুনাহ্ নেই।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২০৩]

এ আয়াতে নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন বলতে আইয়্যামে তাশরীকের দিনসমূহ (তথা জিলহজের ১১, ১২ ও ১৩) কে বুঝানো হয়েছে। আর আইয়ামে তাশরীকের প্রথম দিন হচ্ছে ১১ তারিখ। অতএব, উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি আইয়ামে তাশরীকের মধ্য থেকে প্রথম দু'দিনে তাড়াহুড়া করে চলে আসবে তার কোনো গুনাহ্ নেই। আর উক্ত দু'দিনের দ্বিতীয় দিন হচ্ছে ১২তম দিন।

সুতরাং প্রত্যেকের উচিৎ এ মাসআলাটি ভালোভাবে অনুধাবন করা এবং ভুল সংশোধন করে নেওয়া।

রাতের বেলায় মিনায় স্থান না পেলে কি করবে?

প্রশ্ন: (৫৩৩) মিনায় স্থান না পাওয়ার কারণে কোনো লোক যদি সেখানে শুধুমাত্র রাতের বেলায় আগমণ করে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করে। তারপর মক্কা চলে যায় এবং রাত ও দিনের অবশিষ্ট অংশ তথায় অবস্থান করে তবে কি হবে?

উত্তর: তার এ কাজ যথেষ্ট হবে। কিন্তু এর বিপরীত করাই উত্তম। উচিৎ হচ্ছে, হাজী সাহেব রাত ও দিনের পূরা সময় মিনাতেই অতিবাহিত করবে। ভালোভাবে অনুসন্ধান করার পরও যদি কোনো মতেই মিনার অভ্যন্তরে স্থান করতে না পারে, তবে সর্বশেষ (খীমা বা) তাঁবুর সংলগ্ন স্থানে তাঁবু করে সেখানে অবস্থান করবে যদিও তা মিনার বাইরে পড়ে। বর্তমান যুগের কোনো কোনো বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন যে, কোনো মানুষ যদি মিনায় অবস্থান করার স্থান না পায়, তবে মিনায় রাত কাটানো রহিত হয়ে যাবে। তখন তার জন্য জায়েয হয়ে যাবে মক্কা বা অন্য কোনো স্থানে রাত কাটানো। তাদের কিয়াস হচ্ছে, কোনো মানুষের অযুর কোনো অঙ্গ যদি কাটা থাকে তখন সেটা ধৌত করা রহিত হয়ে যায়। কিন্তু তাদের এ মত যুক্তিসংগত নয়। কেননা অযুর অঙ্গের বিষয়টি ঐ ব্যক্তির পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু মিনায় রাত কাটানোর বিষয়টির উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমস্ত লোকের একস্থানে সমবেত থাকা। সকলে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে প্রকাশ ঘটানো। সুতরাং ওয়াজিব হচ্ছে, মিনার শেষ তাঁবুর পাশে তাঁবু বানিয়ে থাকা, যাতে করে সে হাজীদের সাথেই রাত কাটাতে পারে। এর উদাহরণ হচ্ছে, সালাতের

জামা‘আতে যদি মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়, আর লোকেরা মসজিদের আশে-পাশে বাইরে সালাতে দাঁড়ায়, তবে আবশ্যক হচ্ছে কাতার মিলিত হওয়া। যাতে করে তারা একই জামা‘আতভুক্ত একথা প্রমাণ হয়। রাত কাটানোর বিষয়টি এর সাথে সামঞ্জস্যশীল, শরীরের কর্তিত অঙ্গের সাথে এর তুলনা করা উচিৎ নয়।

বিদায়ী তাওয়াফ করার পর মক্কায় অবস্থান করার বিধান

প্রশ্ন: (৫৩৪) জনৈক ব্যক্তি সকালে বিদায়ী তাওয়াফ করে ঘুমিয়ে পড়ে এবং আছরের পর সফর করার ইচ্ছা করে। তাকে কী কিছু করতে হবে?

উত্তর: হজ ও উমরা উভয় ক্ষেত্রে তাকে পুনরায় বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

"সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[৪০] একথাটি নবীজি বিদায় হজে বলেছেন। সুতরাং বিদায়ী তাওয়াফের বিধান সেই সময় থেকে শুরু হয়েছে। একথা বলা ঠিক হবে না যে, নবী তো বিদায় হজের পূর্বে উমরা করেছেন কিন্তু বিদায়ী তাওয়াফ তো করেন নি। কেননা বিদায়ী তাওয়াফের আবশ্যকতার নির্দেশ তো বিদায় হজে পাওয়া গেছে। আর তিনি বলেছেন:

«وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ».

---

[40] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য উহা রহিত।

“হজে যেভাবে কাজ করে থাক উমরাতেও সেভাবে করো।”[৪১] এ নির্দেশটি ব্যাপক অর্থবোধক। কিন্তু তার মধ্যে ব্যতিক্রম হচ্ছে ‘আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। কেননা সর্বসম্মতিক্রমে একাজগুলো হজের সাথে সম্পর্কিত। এগুলো ছাড়া বাকী কাজ উক্ত হাদীসের আওতাধীন থাকবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাকে ছোট হজরূপে আখ্যা দিয়েছেন।[৪২] যেমনটি আমর ইবন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুরসাল[৪৩]। কিন্তু আলেমগণ সাধারণভাবে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহ তা‘আলা বলেন, “তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ কর।” বিদায়ী তাওয়াফ যদি হজের পূর্ণতার অংশ হয়, তবে তা উমরারও পূর্ণতার অংশ হবে।

উমরাকারী মসজিদে হারামের তাহিয়্যাত হিসেবে তাওয়াফের মাধ্যমে ভিতরে প্রবেশ করেছে। সুতরাং কোনো তাহিয়্যাত ছাড়া চলে যাওয়াও উচিৎ হবে না। তাই সে বিদায়ী তাওয়াফ করবে।

অতএব, এ ভিত্তিতে হজের ন্যায় উমরাতেও বিদায়ী তাওয়াফ করা

---

[41] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে; সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

[42] দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং (১২২)

[43] যে হাদীসের সনদ হতে ছাহাবীর নাম বাদ পড়ে যায় তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

ওয়াজিব। তিরমিযীতে একটি হাদীস পাওয়া যায়: বলা হয়েছে, "কোনো লোক যদি হজ বা উমরা করে, সে আল্লাহর ঘরের বিদায়ী তাওয়াফ না করে যেন বের না হয়।" কিন্তু এ হাদীসটি য'ঈফ বা দুর্বল। কেননা এর সনদে হাজ্জাজ ইবন আরত্বাত নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে। সে দুর্বল। এ হাদীসটি দুর্বল না হলে এ মাসআলার সুস্পষ্ট দলীল হিসেবে বিবেচিত হত এবং সকল মতভেদ বিদূরীত হত। কিন্তু দুর্বল হওয়ার কারণে তা দ্বারা দলীল গ্রহণ করার কোনো ভিত্তি নেই। তবে আমরা পূর্বে যে সমস্ত মূলনীতি, দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছি তার ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, উমরায় বিদায়ী তাওয়াফ ওয়াজিব।

তাছাড়া এ তাওয়াফ সতর্কতা ও যিম্মা মুক্তিস্বরূপও হয়ে যায়। কেননা উমরাতে আপনি বিদায়ী তাওয়াফ করলে তো কেউ আপনাকে বলবে না যে আপনি ভুল করছেন। কিন্তু তা না করলে তো যারা তা ওয়াজিব মনে করে তারা বলবে, আপনি ভুল করলেন। এ কারণে তাওয়াফ করাটাই সঠিক হবে। আর তাওয়াফ না করলে আশংকা রয়ে যাবে এবং বিদ্বানদের কারো মতে তা ভুল হবে। (আল্লাহই অধিক জ্ঞানী)

প্রশ্ন: (৫৩৫) উমরাকারীর জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করার বিধান কী?

উত্তর: উমরাকারী মক্কা আগমণ করার সময় যদি নিয়ত করে যে, তাওয়াফ, সা'ঈ ও মাথা মুণ্ডন তথা উমরার কার্যাদী সম্পন্ন করার সাথে সাথে ফেরত চলে যাবে, তবে তাকে বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। কেননা তাওয়াফে কুদূমই তার জন্য উমরার তাওয়াফ ও বিদায়ী তাওয়াফ হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু উমরা সম্পন্ন করার পর যদি মক্কায় অবস্থান

করে তবে প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, বিদায়ী তাওয়াফ করা ওয়াজিব। একথার দীলল নিম্নরূপ:

প্রথমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপক নির্দেশ:

«لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ».

"সর্বশেষ কাজ বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ না করে কেউ যেন বের না হয়।"[৪৪] এখানে أَحَدٌ বা 'কেউ' শব্দটি অস্পষ্ট। যে কেউ বের হলেই তার জন্য উক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। অর্থাৎ তাওয়াফ না করে বের হবে না। সে হজকারী হোক বা উমরাকারী।

দ্বিতীয়তঃ উমরা হজের মতোই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরাকে হজরূপে আখ্যা দিয়েছেন। আমর ইবন হাযম কর্তৃক প্রসিদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ।"[৪৫] হাদীসটি মুরসাল, কিন্তু আলেমগণ সাধারণভাবে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন।

---

[44] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: বিদায়ী তওয়াফ ওয়াজিব এবং ঋতুবতীর জন্য উহা রহিত।

[45] দারাকুতনী ২/২৮৫ হাদীস নং (১২২)

তৃতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত উমরা হজের মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।[৪৬] অর্থাৎ হজ করলে উমরাও আদায় হয়ে গেল।

চতুর্থতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ালা ইবন উমাইয়াকে বলেন,

«وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ»

“হজে যেভাবে কাজ করে থাক উমারাতেও সেভাবে করো।”[৪৭] যদি তুমি হজে বিদায়ী তাওয়াফ করে থাক, তবে উমরাতেও তা কর। তবে বিদ্বানদের ঐকমত্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উক্ত নির্দেশের বাইরে থাকবেঃ আরাফা, মুযদালিফা ও মিনাতে অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ। এগুলো উমরাতে করা শরী‘আত সম্মত নয়। তাছাড়া সতর্কতার জন্য এবং যিম্মা মুক্ত হওয়ার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ করে নেওয়াই উচিৎ।

---

[46] সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজের মাসসমূহে উমরা করা জায়েয।

[47] সহীহ বুখারী, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: খালূক রং কাপড়ে লাগলে তা তিনবার ধৌত করতে হবে সহীহ মুসলিম, অধ্যায়: হজ, অনুচ্ছেদ: হজ ও উমরায় ইহরামকারীর জন্য যা বৈধ।

ইহরাম বাঁধার পর হজ সম্পন্ন করতে বাধাপ্রাপ্ত হলে করণীয় কী?

প্রশ্ন: (৫৩৬) জনৈক ব্যক্তি মীক্বাত থেকে হজের ইহরাম বেঁধেছে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে সে প্রশাসন (ডিউটি পুলিশ) কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। কেননা সে হজের অনুমতি পত্র নেয়নি। এখন তার করণীয় কী?

উত্তর: এ অবস্থায় মক্কা প্রবেশ করতে না পারলে সে ‘মুহছার’ বা বাধাগ্রস্ত বলে বিবেচিত হবে। তখন বাধাপ্রাপ্ত স্থানে হাদঈ যবেহ করে সে ইহরাম খুলে ফেলবে। যদি ইহা তার প্রথম ফরয হজ হয়ে থাকে তবে পরবর্তী বছর তা আদায় করবে। আর ফরয না হয়ে থাকলে বিশুদ্ধ মতানুযায়ী পরবর্তী বছর তা আদায় করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বছরে বাধাপ্রাপ্ত হলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেন নি। অতএব, আল্লাহর কিতাবে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে বাধাপ্রাপ্ত হজ বা উমরা কাযা আদায় করার বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

“যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজসাধ্য কুরবানী করবে।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

এখানে হাদঈ যবেহ করা ছাড়া অন্য কিছু উল্লেখ করা হয় নি। আর পরবর্তী বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উমরা আদায়কে কাযা উমরা এজন্যই বলা হয়েছে যে, তিনি কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে পরবর্তী বছর উমরা আদায় করবেন। এ কারণে নয় যে,

ছুটে যাওয়া কাজের পূর্ণতার জন্য কাযা আদায় করেছিলেন। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন: (৫৩৭) হজের ইচ্ছা করার পর যদি তাকে নিষেধ করে দেওয়া হয়, তবে তার করণীয় কী?

উত্তর: যদি সে ইহরাম না করে থাকে তবে কোনো অসুবিধা নেই। কোনো কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কেননা কোনো লোক ইহরামে প্রবেশ করার পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছা করলে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে, ইচ্ছা করলে নিজ ঠিকানায় ফেরত আসতে পারে। কিন্তু হজ ফরয হলে, যতদ্রুত সম্ভব আদায় করে নেওয়া ভালো।

আর ইহরামে প্রবেশ করার পর বাধাগ্রস্ত হলে যদি ইহরাম বাধার সময় শর্ত করে থাকে এ বলে, "আল্লাহুম্মা ইন্ হাবাসানী হাবেস্, ফা মাহেল্লী হায়ছু হাবাস্তানী", তবে বাধাপ্রাপ্ত স্থানে ইহরাম খুলে ফেলবে। কোনো কিছু তার উপর আবশ্যক হবে না। কিন্তু যদি শর্ত করার জন্য এরূপ দো'আ পাঠ না করে থাকে, তবে উক্ত বাধা অচিরেই বিদূরিত হওয়ার আশা থাকলে অপেক্ষা করবে এবং হজ পূর্ণ করবে। আরাফাতে অবস্থানের পূর্বে যদি বাধামুক্ত হয়, তবে 'আরাফাতে অবস্থান করে হজ পূর্ণ করবে। কিন্তু আরাফাতে অবস্থানের পর বাধা মুক্ত হলে, হজ ছুটে গেল। তখন উমরা আদায় করে ইহরাম খুলে ফেলবে। ফরয হজ হয়ে থাকলে পরবর্তী বছর তা কাযা আদায় করবে। কিন্তু অচিরেই বাধা মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে এবং শর্ত না করে থাকলে ইহরাম খুলে ফেলবে এবং হাদঈ যবাই করবে। কেননা আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]

"তোমরা আল্লাহর জন্য হজ-উমরা পূর্ণ করবে। যদি বাধাগ্রস্ত হও, তবে সহজসাধ্য হাদঈ প্রদান করবে।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৬]

প্রশ্ন: (৫৩৮) হজ করতে এসে পাপের কাজে লিপ্ত হলে কি হজের ছাওয়াব কমে যাবে?

উত্তর: সাধারণভাবে সবধরণের পাপকাজ হজের সাওয়াব হ্রাস করে দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]

"যে ব্যক্তি ঐ মাসগুলোর মধ্যে হজের সংকল্প করবে, সে স্ত্রী সহবাস, গর্হিত কাজ ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে পারবে না।" [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৯৭]

বরং বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেছেন, হজ অবস্থায় পাপ কাজ করলে হজ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্বানদের নিকট প্রসিদ্ধ মূলনীতি হচ্ছে: "হারাম কাজটি যদি ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট না হয়, তবে তার কারণে ইবাদত বাতিল হবে না।" সাধারণ পাপসমূহ হজের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। কেননা তা হজের সময় যেমন হারাম অন্য সময়ও হারাম। এটাই বিশুদ্ধ মত। এ সমস্ত পাপকাজ হজ্জকে বাতিল করে দিবে না। কিন্তু তার সাওয়াব বিনষ্ট করে দিবে।

প্রশ্ন: (৫৩৯) মিথ্যা পাসপোর্ট বানিয়ে হজ করলে হজ হবে কী?

উত্তর: তার হজ হয়ে যাবে। হজ বিশুদ্ধ হবে। কেননা পাসপোর্ট নকল করা হজের কর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হজের বাইরের কাজ। কিন্তু এ কাজের কারণে সে গুনাহগার হবে। তাকে তাওবা করা উচিৎ। কেননা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বা প্রশাসনকে ধোঁকা দেওয়া একটি মারাত্মক অপরাধ ও বড় গুনাহর কাজ।

জেনে রাখা উচিৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দিবেন, তাকে ধারণাতীত রিযিক দান করবেন, তার সকল কাজ সহজ করে দিবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করবে, সত্য কথা বলবে এবং সৎ পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তার কর্ম সংশোধন করে দিবেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

দীন ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে পাঁচটি বিষয়ের ওপর। এ পাঁচটি ভিত্তি সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নের অন্ত নেই। তাই নির্ভরযোগ্য প্রখ্যাত আলিমে দীন, যুগের অন্যতম সেরা গবেষক আল্লামা শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালেহ আল-উসাইমীন রহ. ঐ সকল জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক নির্ভরযোগ্য জবাব প্রদান করেছেন উক্ত বইটিতে। প্রতিটি জবাব পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য উলামাদের মতামত থেকে দেওয়া হয়েছে। সেই জবাবগুলোকে একত্রিত করে বই আকারে বিন্যস্ত করেছেন জনাব ‘ফাহাদ ইবন নাসের ইবন ইবরাহীম আল-সুলাইমান’। নাম দিয়েছেন ‘ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম’। এ অংশে তিনি হজ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।